আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

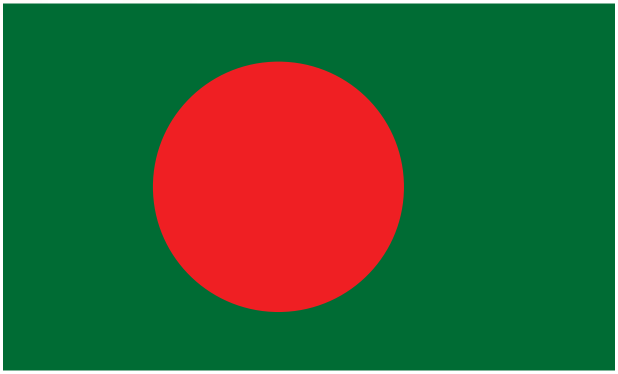

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা তৈরির নিয়ম

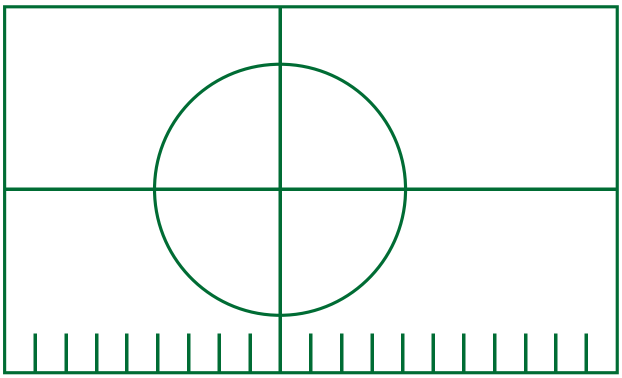

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আরেকটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

পতাকার মাপ

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি (২½' x ১½')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর
শুভাশিস চক্রবর্ত্তী
মোঃ মাহমুদুল হাসান
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
খুরশীদা আক্তার জাহান
সাইফা সুলতানা

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

সাজ্জাদ মজুমদার
মোঃ মহিদুল হাসান

গ্রাফিক ডিজাইন

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করাও এই স্তরের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটির প্রতি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

পঞ্চম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণত দশ বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠগ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ ও সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পাঠ	পাঠের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ	১
২	তিতুমীর	৬
৩	দূরের পাল্লা	১৯
৪	পত্র লিখি	২৪
৫	ঠিক আছে	২৮
৬	সুখু আর দুখু	৩২
৭	সাইক্লোন	৩৮
৮	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	৪২
৯	টুকটুক ও চিকু	৪৭
১০	রাখাল ছেলে	৫৩
১১	কুটির শিল্প	৫৭
১২	শিষ্যের সাধনা	৬৩
১৩	পাখির মতো	৬৯
১৪	কুপোকাত	৭৪
১৫	সংকল্প	৮৪
১৬	স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা	৯০
১৭	মাটির নিচে পুরানো নগর	৯৮
১৮	ইচ্ছামতী	১০২
১৯	ভাষার খেলা	১০৭
২০	শিক্ষাগুরুর মর্যাদা	১১২
২১	বিদায় হজের ভাষণ	১১৯
২২	আমরা তোমাদের ভুলব না	১২৪
২৩	পোস্টার লিখি, প্ল্যাকার্ড লিখি	১৩০

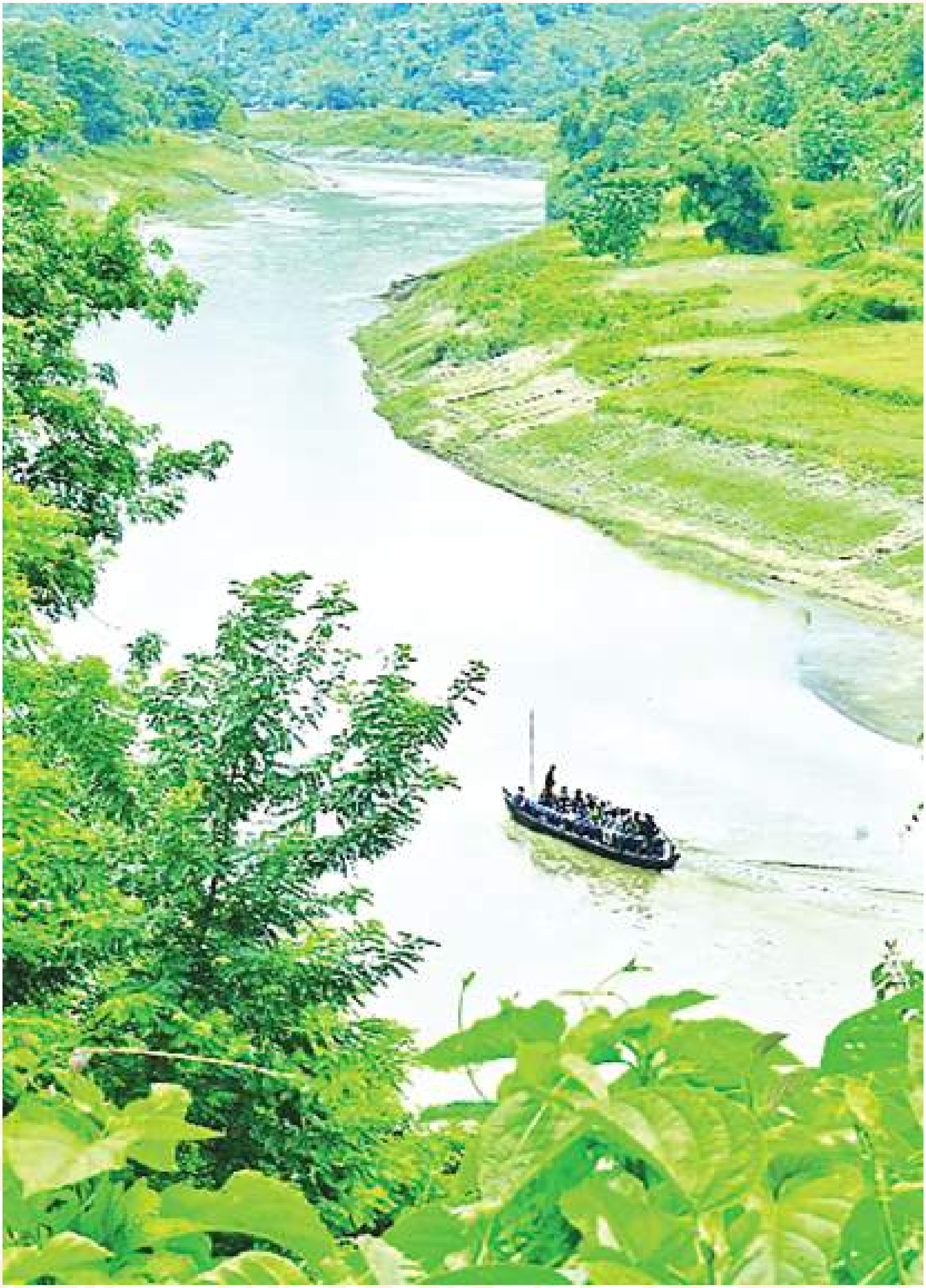

পাঠ ১

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষের রয়েছে নানা রকম বৈচিত্র্য।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে। বাংলা ভাষা ছাড়াও এদেশে আরো কয়েকটি ভাষা রয়েছে। যেমন–চাকমা, মারমা, ককবরক, ওঁরাও, মান্দি, সাঁওতালি ইত্যাদি। সবাই নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে।

বাংলাভাষী মানুষেরা বাঙালি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা। কেউ আবার অন্য জাতির। রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস করে গারো সম্প্রদায়ের মানুষ। সিলেটে আছে মণিপুরি সম্প্রদায়।

মাতৃভাষার বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এ দেশে রয়েছে ধর্মের বৈচিত্র্য। এদেশে প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ আর খ্রিষ্টান। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা আর খ্রিষ্টানদের বড়দিন। এ দেশে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। এগুলোর বাইরেও আরো কিছু উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। যেমন– পহেলা বৈশাখে উদ্‌যাপিত হয় বাংলা নববর্ষ। রাখাইনদের উৎসবের নাম সাংগ্রাই, আর চাকমাদের উৎসব বিজু।

বাংলাদেশে অনেক পেশার মানুষ আছে। যেমন—কৃষক, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি। মানুষ যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই কাজকে তার পেশা বলে। ফসলের মাঠে কৃষক লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করেন। জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরেন। কামার আগুন, হাঁপর আর হাতুড়ির সাহায্যে লোহার জিনিস তৈরি করেন।

কুমার নরম কাদামাটি নিয়ে চাকায় ঘুরিয়ে মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরি করেন। তাঁতি কাপড় বোনেন। এছাড়া বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে আরো নানা পেশার মানুষ দেখা যায়। সব পেশার মানুষই পরিশ্রমী। তাদের শ্রম বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদেও বৈচিত্র্য আছে। পাজামা-পাঞ্জাবি, শার্ট-প্যান্ট, শাড়ি-ব্লাউজ, সালোয়ার-কামিজ– আরো কত রকমের পোশাক যে আছে! ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পোশাকেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। চাকমাদের পোশাকের নাম পিনোন ও হাদি। মারমাদের পোশাকের নাম দেয়াহ। সাঁওতালরা পরে থাকে পাঞ্চি নামের একধরনের পোশাক। গারোদের পোশাকের নাম দকমান্দা।

এ দেশে নানা রকম যানবাহন দেখা যায়। নদীপথে নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ চলে। রাস্তায় চলে বাস, মোটর গাড়ি, রিকশা ও সাইকেল। রেললাইন ধরে চলে রেলগাড়ি। আকাশে ওড়ে উড়োজাহাজ। একস্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়া-আসা করার জন্য আমাদের বাহন লাগে।

বাংলাদেশের মানুষের চেহারা আর শারীরিক গঠনেও রয়েছে বৈচিত্র্য। তবে যত রকম বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন, সবাই বাংলাদেশকে ভালোবাসে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাই একসাথে কাজ করে।

অর্থ জেনে নিই

উদ্‌যাপন	—	পালন
ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী	—	আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সম্প্রদায়।
জীবিকা নির্বাহ	—	জীবনযাপন।
ট্রাক্টর	—	চাষের কাজে ব্যবহার করা হয় এমন যান্ত্রিক লাঙল।
বৈচিত্র্য	—	নানান ধরন।
স্বাচ্ছন্দ্য	—	আরাম; স্বস্তি।
হাঁড়িকুড়ি	—	হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি।
হাঁপর	—	কামারের চুল্লিতে হাওয়া দেওয়ার নলযুক্ত চামড়ার তৈরি থলে।

অনুশীলনী

১. বর্ণ সাজিয়ে শব্দ লিখি।

মিজন্মভূ	রিরীকশা	ত্র্যচিবৈ	তিসম্প্রী	গোতিষ্ঠীজা
....	....	....	....	....

২. শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

সাংগ্রাই	রেললাইন	উৎসব	জীবিকা	সমৃদ্ধ

ক. এ দেশে আছে নানা ধরনের ....।

খ. বৈচিত্র্য আর ভিন্নতাই .... করেছে দেশকে।

গ. .... ধরে চলে রেলগাড়ি।

ঘ. রাখাইনদের রয়েছে .... আর চাকমাদের বিজু উৎসব।

ঙ. মানুষ যে ধরনের কাজ করে .... নির্বাহ করে, সেই কাজকে তার পেশা বলে।

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশে আর কোন কোন ভাষায় মানুষ কথা বলে?

খ. বাংলাদেশে কী কী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়?

গ. সড়ক, নদী ও আকাশপথে কী কী বাহন দেখা যায়?

ঘ. কোন পেশার মানুষ কী কাজ করে?

ঙ. বৈচিত্র্য কীভাবে বাংলাদেশকে সুন্দর করেছে?

৪. ‘বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ’ পাঠ থেকে **কে, কারা, কী, কেন, কোথায়, কীভাবে, কখন** ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন তৈরি করি।

ক. আমাদের দেশের নাম কী?

খ. ....

গ. ....

ঘ. ....

ঙ. ....

চ. ....

ছ. ....

৫. বাংলাদেশের কোনো একটি বৈচিত্র্য নিয়ে ছবি আঁকি ও বিবরণ লিখি।

৬. জোড়ায় বসে শব্দ নিয়ে খেলি।

একজন একটি শব্দ লিখবে, অন্যজন শব্দের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে আরেকটি শব্দ লিখবে। এভাবে চলতে থাকবে।

সংগ্রাম →	মচমচে →	চালাকি →	→	→ ↓
←	←	←	←	
↓ →	→	→	→	↓
←	←	←	←	
↓ →	→	→	→	

পাঠ ২

তিতুমীর

১৭৮২ সাল। হায়দারপুর গ্রামে জন্ম হলো এক শিশুর।

হঠাৎ করে শিশুটির কঠিন অসুখ করল।

দশ-বারো দিন পর...

তিতুমীর পড়ত গ্রামের মাদ্রাসায়।

তিতুমীর ডন-কুস্তি করত।

লাঠিখেলা করত।

তির ছোড়া শিখত।

তরবারি চালনা শিখত।

তখন বাংলাদেশ শাসন করত ইংরেজরা।

অন্যদিকে ছিল জমিদারদের অত্যাচার।

তিতুমীর স্বাধীনতার কথা বললেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললেন।

টিটুমির বড্ড অসুবিডা করিটেসে।

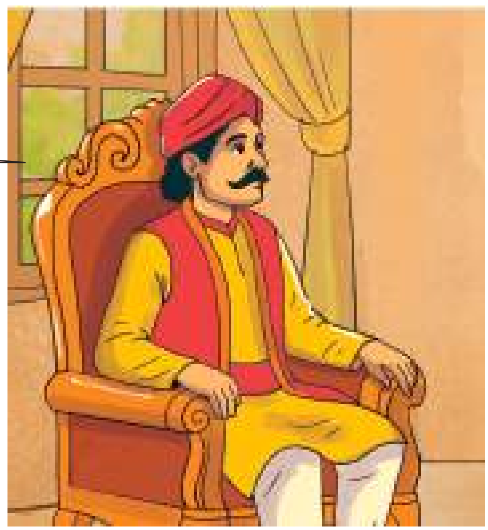
নাহ, তিতুমীরকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। ওকে শায়েস্তা করতে হবে।

তিতুমীর গ্রাম ছেড়ে নারকেলবাড়িয়ায় গেলেন।

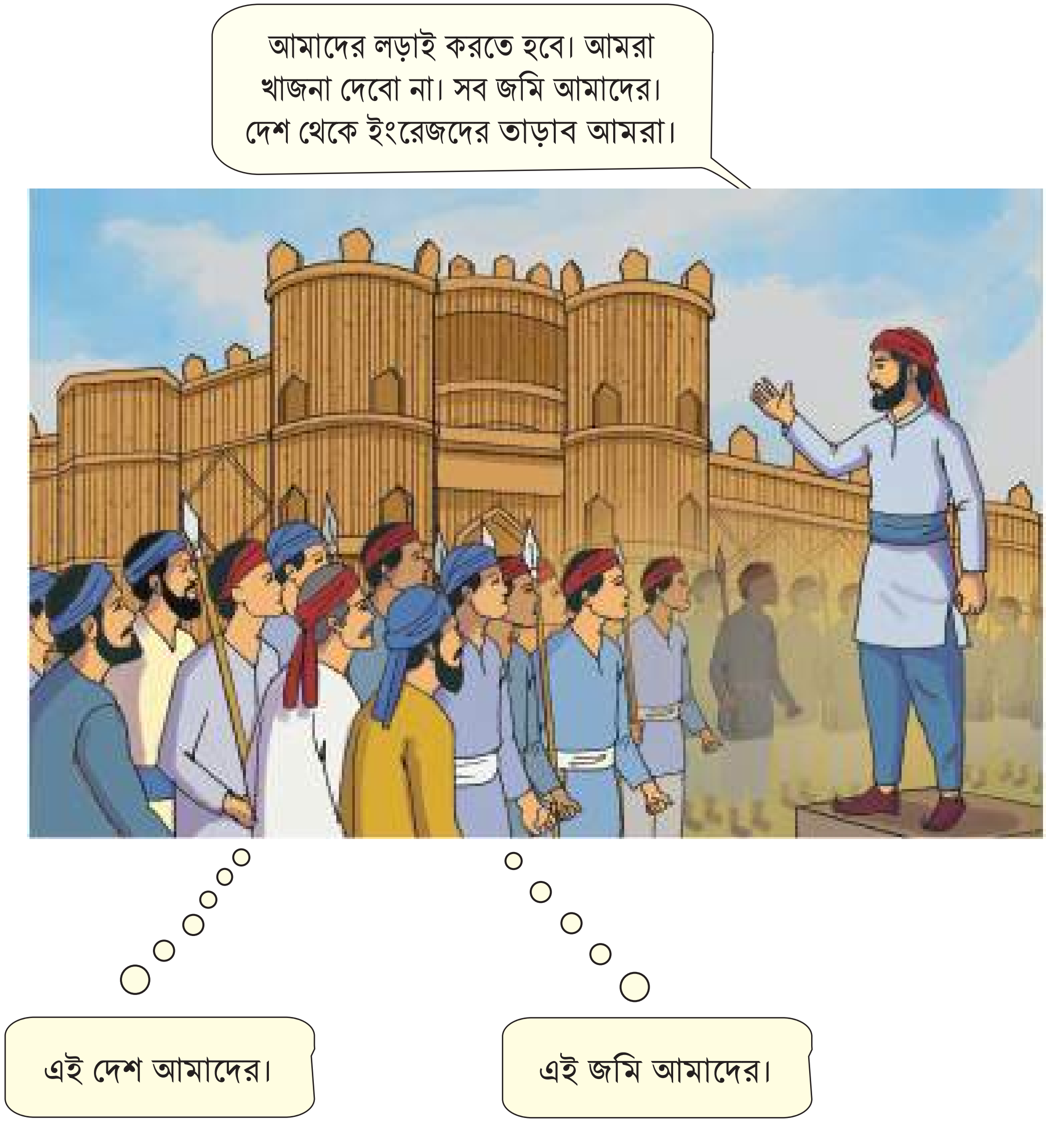

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়ে সেখানে তরুণদের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হলো তিতুমীরকে দমন করার জন্য। কিন্তু তিনি সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

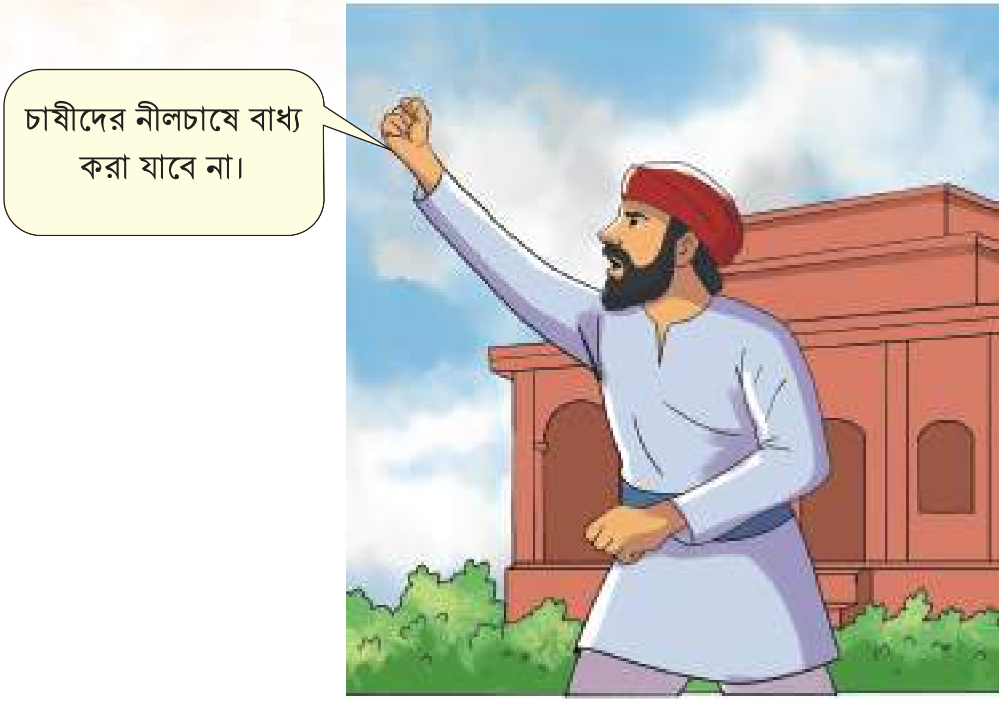

তিতুমীর কয়েকটা নীলকুঠি দখল করে নিলেন।

১৮৩১ সাল। লর্ড বেন্টিঙ্ক বিশাল সেনাবহর পাঠালেন তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য।

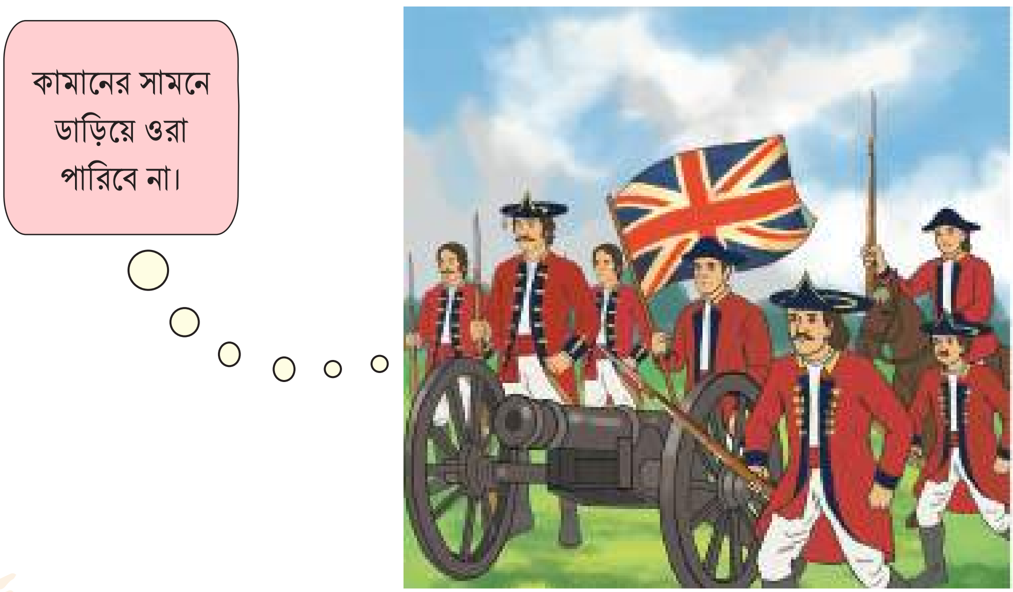

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। ইংরেজরা বাঁশের কেল্লায় হামলা চালাল।

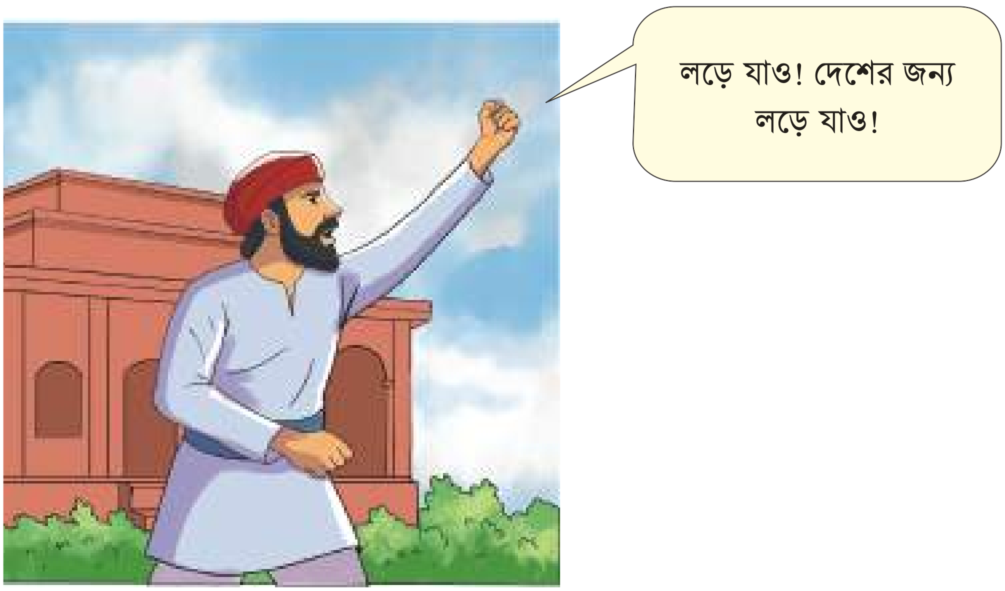

হঠাৎ একটা গুলি লাগল তিতুমীরের বুকে। বাঁশের কেল্লাতেই প্রাণ গেল তাঁর।

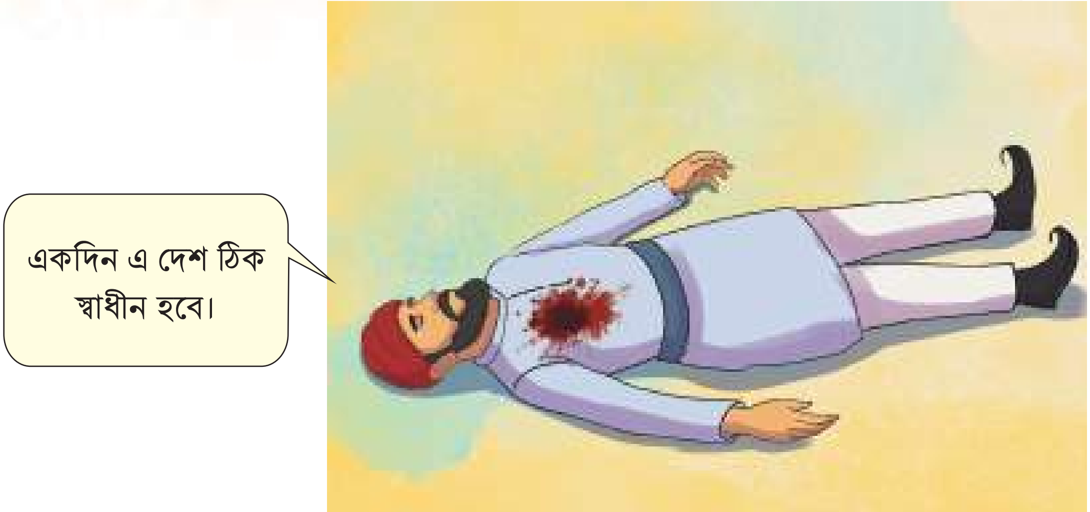

তিতুমীরের অনেক সঙ্গীকে বন্দি করা হলো।

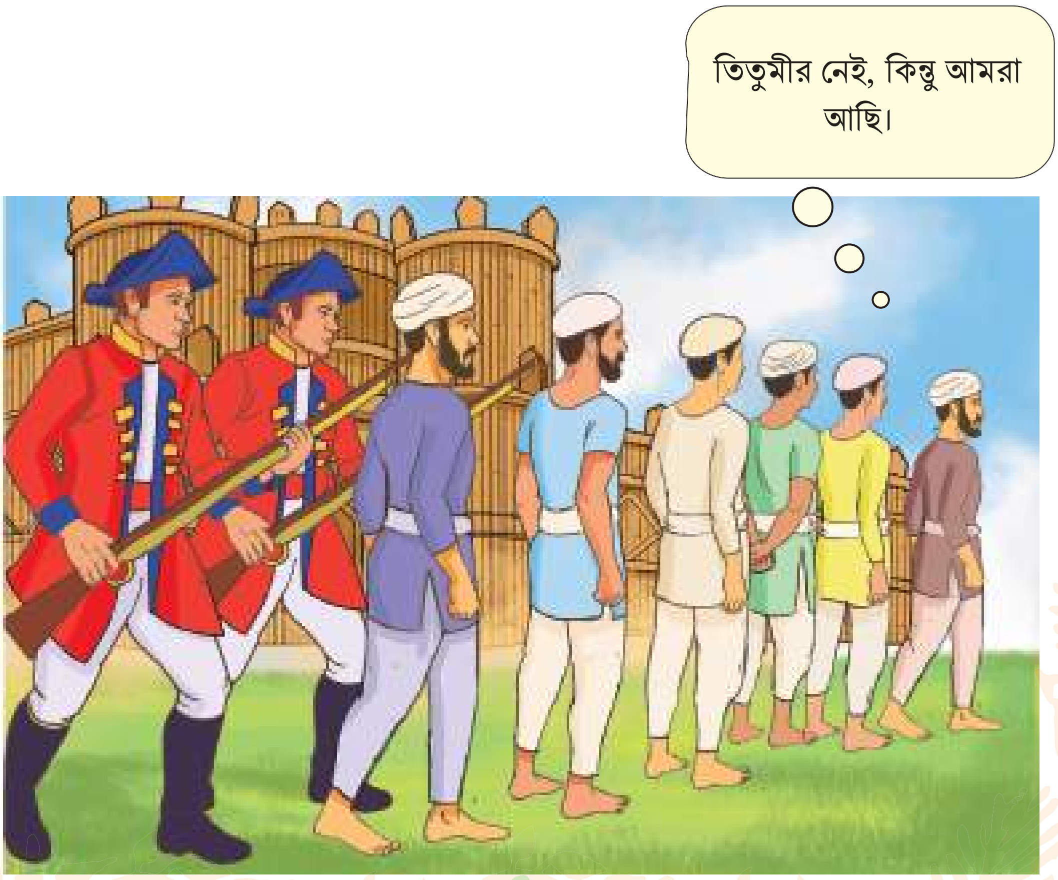

অর্থ জেনে নিই

আগে বাড়ো	—	সামনে এগিয়ে যাও।
চাবকে	—	চাবুক মেরে।
দুর্গ	—	শক্তিশালী ও সুরক্ষিত সামরিক স্থাপনা।
প্রশিক্ষণ	—	হাতে-কলমে শিক্ষা।
বাঁশের কেল্লা	—	বাঁশ দিয়ে তৈরি দুর্গ।
বান	—	বন্যা।
লড়াই	—	যুদ্ধ।
শায়েস্তা	—	দমন; শাস্তি; সাজা।
সেনাবহর	—	সেনাদল।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করি।

ক. শিশুটির কঠিন .... করল।

খ. তিতুমীর .... বিরুদ্ধে কথা বলতেন।

গ. তিতুমীর বাঁশের কেল্লায় .... প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন।

ঘ. দেশের .... জন্য কিছু করা দরকার।

ঙ. লর্ড বেন্টিঙ্ক বিশাল .... পাঠালেন।

২. বিপরীত শব্দ লিখে বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
ছোটো	বড়ো	আমাদের গ্রামে বড়ো একটি বটগাছ আছে।
তেতো		
বিরুদ্ধে		
দমন		
তরুণ		
স্বাধীন		
বন্দি		

৩. প্রশ্নের উত্তর লিখি।

ক. তিতুমীরের জন্ম কত সালে?

খ. তিতুমীর কী কী করতেন?

গ. ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কেন পাঠানো হয়েছিল?

ঘ. নীলচাষিরা কীভাবে তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন?

ঙ. ইংরেজদের হাত থেকে এদেশকে মুক্ত করার চিন্তা তিতুমীরের মনে কেন এসেছিল?

চ. দেশের কল্যাণের জন্য তুমি কী কী করতে চাও, তা লেখ।

৪. নিচের বাক্যগুলোতে বিরামচিহ্ন বসাই।

ক. খুব তেতো ওষুধ

খ. খাজনা দিবি না

গ. হুজুর আমি গরিব মানুষ

ঘ. তিতুমীর নেই কিন্তু আমরা আছি

ঙ. তিতুমীর বললেন এবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব আমরা

৫. পাঠে তিতুমীর যা যা বলেছেন, আলাদা করে লিখি।

৬. ইংরেজদের বলা শব্দগুলো সঠিকভাবে জানি।

ডেশ	দেশ
অসুবিডা	অসুবিধা
ঢোনি	ধনী
করিটেসে	করিতেছে
ডাড়িয়ে	দাঁড়িয়ে

৭. নিচের দাগ দেওয়া শব্দগুলো কোনটি কোন পদ লিখি।

আজ শুক্রবার। রাজু ও তিথির স্কুল বন্ধ। তারা একই শ্রেণিতে পড়ে। দুজনই খুব মেধাবী। প্রতিদিন তারা মাঠে খেলা করে।

৮. নিচের বাক্যগুলোতে 'হাত' শব্দটি কোনটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা লিখি।

বাবার এখন হাত খালি। :

সে তোমাকে একহাত দেখে নেবে। :

মিনার হাত ভেঙে গেছে। :

হাত চালাও, দেরি করো না। :

তার হাতটানের অভ্যাস আছে। :

৯. শিক্ষকের সহায়তায় গল্পটি অভিনয় করি।

পাঠ ৩

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়—
তিনজন্ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা!

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল-জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ-চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দেয় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বৌটি!

ঝকঝক কলসীর
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্ গো।

তিন-দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিনজন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে?

অর্থ জেনে নিই

উন্মন — উদাস; আনমনা।
চৌপর — চার প্রহর; সারা দিন।
ছিপ — সরু নৌকা।
জঞ্জাল — আগাছা।
টাঁকশাল — টাকা তৈরির কারখানা।
তীর-ঘর — নদী তীরের ঘর।
দাঁড় — বৈঠা।
দিনভর — সমস্ত দিন।
পাড়ময় — পাড়জুড়ে।
পানকৌটি — পানকৌড়ি পাখি।
পান্না — সবুজ রঙের দামি রত্ন।
মন্থর — ধীরে।
মাল্লা — মাঝি।

অনুশীলনী

১. শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি।

দিনভর : ....

জঞ্জাল : ....

শ্যাওলা : ....

মন্থর : ....

কঞ্চি : ....

২. সঠিক উত্তর বাছাই করে বাক্যটি পুনরায় লিখি।

ক. কবিতায় (পাঁচ/চার/তিন/দুই) জন মাঝির কথা বলা হয়েছে।

....

খ. নদীর সারা পাড় জুড়ে (বাড়িঘর/ঝোপঝাড়/ফসলের খেত/কাশফুল) রয়েছে।

....

গ. নদীর পানিতে (কলসি/নৌকা/হাঁস/শ্যাওলা) ভাসছে।

....

ঘ. (গাংচিল/মাছরাঙা/বক/পানকৌড়ি) নদীতে ডুব দিচ্ছে।

....

ঙ. (কলসিতে/ হাঁড়িতে/ বালতিতে/ মগে) পানি ভরার বকবক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

....

চ. নৌকা চালাতে চালাতে মাঝিরা (ছড়া বলছে/ গান গাইছে/ ঝগড়া করছে/ চুপ করে আছে)।

....

৩. কবিতাটি হাতে তালি দিয়ে দিয়ে একসাথে বলি।

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বন-হাঁস কী করছে?

খ. নৌকায় যেতে যেতে মাঝিরা কী কী দেখছে?

গ. ঘোমটা দেওয়া বউটি কী করছিল?

ঘ. শৈবালকে কেন টাঁকশাল বলা হয়েছে?

ঙ. কবিতাটি পড়তে ভালো লাগে কেন?

৫. যুক্তবর্ণ খুঁজি, শব্দ বানাই।

যুক্তবর্ণ আছে পাঠ থেকে এমন শব্দ বাছাই করি। যুক্তবর্ণটি ভাঙি। ওই যুক্তবর্ণ দিয়ে আরেকটি শব্দ লিখি।

মাল্লা	ল্ল = ল+ল	উল্লাস
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

৬. জোড়ায় বসে শব্দ তৈরির খেলা করি।

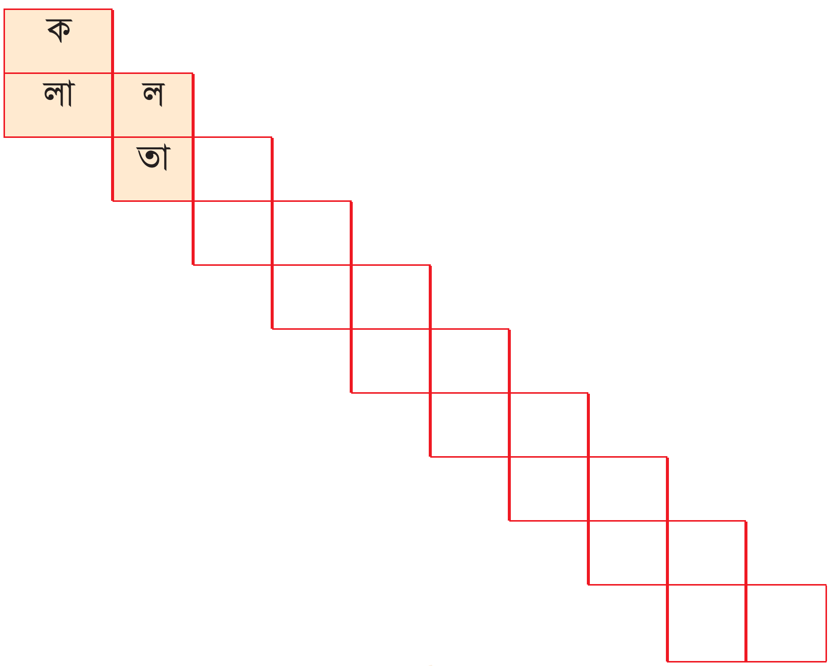

পাঠ ৪

পত্র লিখি

আবেদনপত্রের নমুনা

৫ই মার্চ ২০২৬

প্রধান শিক্ষক
ফুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
বাগেরহাট।

বিষয় : ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। গত ৪ঠা মার্চ, ২০২৬ শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি। উক্ত অনুপস্থিতির দিন ছুটি প্রদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব, একদিনের ছুটি মঞ্জুর করতে আপনার মর্জি হয়।

নিবেদক
সাবেরা মরিয়ম
শ্রেণি: পঞ্চম
রোল নম্বর: ৩২
ফুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগেরহাট।

আবেদনপত্র

আবেদনপত্র হলো বিশেষ এক ধরনের চিঠি। কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদনপত্র লেখা হয়। সাধারণত এ ধরনের পত্রে কোনো অনুরোধ জানানো হয়। আবেদনপত্র যতটুকু সম্ভব ছোটো রাখতে হয়।

আবেদনপত্রে যা যা থাকে—

তারিখ	— যেদিন আবেদনপত্র লেখা হয়, সেদিনের তারিখ।
বরাবর	— যাঁর কাছে আবেদন করা হয়, তাঁর পদবি ও ঠিকানা।
বিষয়	— কোন কারণে পত্রটি লেখা হচ্ছে, সেই বিষয়।
সম্বোধন	— 'জনাব' লিখে সম্বোধন।
বক্তব্য	— আবেদনের বক্তব্য বা মূলকথা।
অনুরোধ	— বক্তব্যটি মেনে নেওয়ার অনুরোধ।
নিজের পরিচয়	— পত্রটি যে লিখছে, তার নাম-পরিচয়।

অনুশীলনী

১. তারিখবাচক শব্দ পড়ি।

১লা বৈশাখ	—	পহেলা বৈশাখ
২রা জুন	—	দোসরা জুন
৩রা ফেব্রুয়ারি	—	তেসরা ফেব্রুয়ারি
৪ঠা আষাঢ়	—	চৌঠা আষাঢ়
৫ই মার্চ	—	পাঁচ মার্চ
২১শে ফেব্রুয়ারি	—	একুশে ফেব্রুয়ারি

২. আবেদনপত্রের বিভিন্ন ভাগের নাম লিখি।

আবেদনপত্রের বিভিন্ন ভাগ	ভাগের নাম
২৮শে মে ২০২৬	
প্রধান শিক্ষক পলাশনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় গাইবান্ধা।	
বিষয়: ছুটির আবেদন।	
জনাব,	
আমি আপনার বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। আগামী ২রা জুন আমার বড়ো বোনের বিয়ে। এজন্য আমার এক দিনের ছুটি দরকার।	
অতএব, উক্ত এক দিনের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।	
নিবেদক আশিক সোবহান শ্রেণি: পঞ্চম রোল নম্বর: ৩২	

৩. প্রধান শিক্ষকের কাছে কী কী কারণে আবেদন করা যায়, এমন বিষয়গুলো লিখি।

....

....

৪. আবেদনপত্র লিখি।

আমি আমার বিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র হারিয়ে ফেলেছি। নতুন পরিচয়পত্র দেওয়ার অনুরোধ করে প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র লিখি।

৫. চিঠি পড়ি।

ঢাকা
০৬/০৩/২০২৬

প্রিয় তিথি

কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমরাও সবাই ভালো আছি। অনেকদিন তোমার সাথে কথা হয় না। সামনে গ্রীষ্মের ছুটি। স্কুল বন্ধ থাকবে। ছুটিতে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসো। তখন সবাই একসাথে চিড়িয়াখানা, শিশুপার্কসহ অনেক জায়গা ঘুরে বেড়াবো। মেট্রোরেলেও চড়বো। খুব মজা হবে না!

তোমাদের বাসার বড়োদের আমার সালাম দিও। আর ছোটদের আদর দিও।

ইতি-

মিলি

৬. চিঠি লিখি।

আমরা বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের কাছে বিভিন্ন সময় চিঠি লিখে থাকি। চিঠিতে আমরা আমাদের মনের কথা লিখি। আমি আমার বাবা-মা অথবা বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লিখি।

পাঠ ৫

ঠিক আছে

সুকুমার বড়ুয়া

অসময়ে মেহমান
ঘরে ঢুকে বসে যান
বোঝালাম ঝামেলার
যতগুলো দিক আছে
তিনি হেসে বললেন,
ঠিক আছে ঠিক আছে।

রেশনের পচা চাল
টলটলে বাসি ডাল
থালাটাও ভাঙা-চোরা
বাটিটাও লিক আছে
খেতে বসে জানালেন,
ঠিক আছে ঠিক আছে।

মেঘ দেখে মেহমান
চাইলেন ছাতাখান
দেখালাম ছাতাটার
শুধু কটা শিক আছে
তবু তিনি বললেন,
ঠিক আছে ঠিক আছে।

অর্থ জেনে নিই

টলটলে — স্বচ্ছ তরল।

মেহমান — অতিথি।

রেশন — কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

লিক — ছিদ্র।

শিক — লোহার কাঠি।

অনুশীলনী

১. বিপরীত শব্দ লিখি এবং বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
অসময়	সময়	সময়মতো হাজির হলাম।
ঠিক	....	....
হেসে	....	....
পচা	....	....
ঢোকা	....	....

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মেহমান সব কথাতেই কী বলেন?

খ. লোকটির সংসারে কী কী ঝামেলা আছে?

গ. কবিতাটি পড়তে কেন মজা লাগে?

ঘ. কবিতাটি নিজের ভাষায় লিখি।

৩. একটি বাক্য ভেঙে দুটি বাক্য বানাই।

ক. আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম সবাই খেলছে।

আমি মাঠে গেলাম। দেখলাম সবাই খেলছে।

খ. আমি এত বার বোঝানোর পরেও তিনি আমার কথা শুনলেন না।

....

গ. তিনি ঘরে ঢুকে কিছু খেতে চাইলেন।

....

ঘ. আমার কথা না শুনেই তিনি চলে গেলেন।

....

ঙ. তিনি খেতে বসে জানালেন সব ঠিক আছে।

....

৪. প্রশ্ন, দুঃখ, অনুরোধ, আদেশ, ইচ্ছা—কোন ভাব বোঝাচ্ছে লিখি।

এভাবে সংসার আর চলে না! ....

আমাকে একটা কলম দাও। ....

তোমার বাড়ি থেকে বিদ্যালয় কত দূরে?...

এক্ষুনি চলে যাও। ....

আমার যদি একটা সাইকেল থাকত! ....

পাঠ ৬

সুখু আর দুখু

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক ছিল তাঁতি। তাঁর দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ের নাম সুখু। আর ছোটো মেয়ের নাম দুখু। বড়ো মেয়ে ঘরের কোনো কাজ করে না। শুধু বসে বসে খায়। দুখু ঘরের সব কাজ করে। সময় পেলে বাবার জন্য সুতা কেটে দেয়।

একদিন দুখু তুলা রোদে দিয়ে উঠানে বসে আছে। এমন সময়ে দমকা বাতাস এসে দুখুর তুলা উড়িয়ে নিয়ে গেল। দুখু মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল।

তখন বাতাস বলল, 'দুখু, কেঁদো না। আমার সাথে এসো। তোমাকে তুলা দেবো।'

দুখু কাঁদতে কাঁদতে বাতাসের পিছু পিছু গেল।

যেতে যেতে একটা কলাগাছের সাথে দেখা হলো। কলাগাছ বলল, ‘দুখু, কোথায় যাচ্ছ? আমাকে অনেক লতাপাতা ঘিরে ধরেছে। এগুলোকে একটু সরিয়ে দিয়ে যাবে?’

কলাগাছের কথা শুনে দুখু থামল। তারপর কলাগাছের গায়ে থাকা লতাপাতা সরিয়ে দিলো।

খানিক দূর যেতেই এক ঘোড়া দুখুকে ডাকল। বলল, ‘দুখু, কোথায় যাচ্ছ? আমাকে কিছু কচি ঘাস দিয়ে যাবে?’

ঘোড়ার কথা শুনে দুখু দাঁড়াল। কচি ঘাস কেটে ঘোড়াকে খেতে দিলো। তারপর বাতাসের সাথে চলতে লাগল।

চলতে চলতে দুখু ধবধবে সাদা একটা বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। সেই বাড়ির দাওয়ায় বসে এক বুড়ি চরকা কাটছে। গায়ে সাদা শাড়ি। চুলগুলোও দুধের মতো সাদা।

বাতাস বলল, ‘দুখু, তুমি বুড়ির কাছে যাও। তার কাছে তুলা চাও, পাবে।’

দুখু তখন বুড়ির কাছে গেল। নরম গলায় বলল, ‘বুড়ি মা, তুমি কেমন আছ?’

বুড়ি তাকিয়ে দেখে, ছোট্ট একটা মেয়ে। কী মিষ্টি তার কথা! বুড়ি বলল, ‘ভালো আছি, বাছা। ডাকছ কেন?’

দুখু বলল, ‘আমার সব তুলা বাতাস উড়িয়ে তোমার কাছে এনেছে!’

বুড়ি বলল, ‘ও ঘরে গামছা আছে, কাপড় আছে। ওগুলো নিয়ে ওই পুকুরে ডুব দিয়ে এসো। তারপর এই ঘরে খাবার আছে, খাও। এরপর তুলা নিয়ো।’

ঘরে গিয়ে দুখু দেখে কত দামি দামি গামছা, কাপড়। কিন্তু সে লোভ করল না। সাধারণ একটা গামছা আর একটা কাপড় নিল। তারপর পুকুরে ডুব দিতে গেল।

কিন্তু কী অদ্ভুত! একটা ডুব দিতেই দুখুর গা সোনার গয়নায় ভরে গেল।

পুকুর থেকে উঠে খাবার ঘরে গেল দুখু। এত এত মজার খাবার সেখানে! দুখু লোভ করল না। শুধু একটু পান্তা ভাত খেলো। তারপর বুড়ির কাছে এলো।

বুড়ি বলল, ‘এখন তুমি ওই ঘরে যাও। যত তুলা লাগে নিয়ে যাও।’

তুলার ঘরে গিয়ে দুখু অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সব তুলা সে নিলো না। যতটুকু তুলা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, ততটুকু তুলা সে প্যাটরায় ভরে নিলো। তারপর সে বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলো।

ফেরার পথে ঘোড়ার সাথে দেখা। ঘোড়া বলল, 'দুখু, এসো এসো। তোমাকে আমি আর কী দেবো? এই নাও।' এই বলে সে একটা পঙ্খিরাজ ঘোড়ার বাচ্চা দিলো।

একটু পরে কলাগাছের সাথে দেখা হলো। কলাগাছ বলল, 'দুখু, এসো, এসো। তোমাকে আর কী দেবো? এই নাও।' এই বলে কলাগাছ মস্ত এক ছড়া সোনার কলা দিলো।

দুখু তুলার প্যাটরা, ঘোড়ার বাচ্চা আর কলার ছড়া নিয়ে বাড়ি ফিরল। এত কিছু দেখে সবাই অবাক! তার উপর দুখুর গা ভরতি গয়না।

সব শুনে সুখুর লোভ হলো। পরদিন সে উঠানে বসল চরকা কাটতে। কিন্তু চরকা ঘুরানোর আগেই জোরে বাতাস এলো। সেই বাতাস সুখুর সব তুলা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সুখু বাতাসের পিছন পিছন ছুটল।

পথের পাশের কলাগাছ সুখুকে ডাকল। বলল, 'সুখু, কোথায় যাচ্ছ? একটু শুনে যাও।'

সুখু ফিরেও তাকাল না। বলল, 'আমার সময় নেই। আমি যাচ্ছি বুড়ির কাছে।'

একটু পরে সেই ঘোড়াও সুখুকে ডাকল। সুখু তার দিকেও ফিরে তাকাল না। শুধু কঠিন গলায় বলল, 'আমি যাচ্ছি বুড়ির বাড়ি। তোমার কথা শুনতে আমার বয়েই গেছে!'

বাতাসের সাথে সাথে সুখু গেল বুড়ির বাড়ি। গিয়েই বুড়িকে বলল, 'ও বুড়ি! তুই বসে বসে কী করছিস? আগে আমার জিনিস দে। তারপর সুতা কাটিস।'

সুখুর কথা শুনে বুড়ি মনে কষ্ট পেল। তবু বলল, 'ও ঘরে গামছা আছে, কাপড় আছে। ওগুলো নিয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে এসো। তারপর এই ঘরে খাবার আছে, খাও। এরপর দেবো।'

সুখু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। সবচেয়ে দামি গামছা আর দামি কাপড় নিলো। তারপর পুকুরে গেল ডুব দিতে।

সে ভাবল, বেশি বেশি ডুব দিলে বেশি বেশি গয়না পাবে। তাই ইচ্ছামতো ডুব দিতে লাগল। একটু পরে বুঝতে পারল তার সারা শরীর চুলকাচ্ছে। কথা বলতে গিয়ে দেখল এমন শোনাচ্ছে, 'আঁমাঁর সাঁরাঁ শঁরীঁর চুঁলকাঁচ্ছেঁ কেঁনঁ?

বুড়ির নামে খারাপ কথা বলে সুখু খাওয়ার ঘরে গেল। সেখানে পায়েস, পিঠা আর ভালো ভালো খাবার ছিল। সুখু সেগুলো গপ গপ করে খেতে লাগল। পেট ঢোল করে খেয়ে এলো বুড়ির কাছে। কঠিন গলায় সুখু বলল, 'আঁর দেঁরিঁ কঁরতেঁ পাঁরবঁ নাঁ। আঁমাঁর তুঁলাঁ তাঁড়াঁতাঁড়িঁ দেঁ।'

বুড়ি বলল, 'ওই ঘরে যাও। তোমার তুলা তুমি নিয়ে যাও।'

সুখু তুলার ঘরে গেল। বিশাল এক প্যাটরা ভরে ইচ্ছামতো তুলা নিলো। তারপর সেটা কাঁধে নিতেই কুঁজো হয়ে গেল। তারপর গা চুলকাতে চুলকাতে বাড়ির পথ ধরল।

খানিক পরে পথে ঘোড়ার সাথে দেখা হলো। সুখুকে দেখে ঘোড়া দিলো একটা লাথি। লাথি খেয়ে সুখু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে হাঁটতে লাগল।

এরপর দেখা হলো কলাগাছের সাথে। কলাগাছের একটা বড়ো পাতা ভেঙে পড়ল সুখুর মাথায়। সুখু 'মঁলাঁম মঁলাঁম' বলে সেখান থেকে পালাল।

বাড়িতে ফিরে সুখু ভারী প্যাটরা নিচে রাখল। তারপর ইচ্ছামতো গা চুলকিয়ে নিলো। এরপর সবাইকে ডেকে বলল, 'আঁমিঁ চঁলেঁ এঁসেঁছিঁ।'

সুখুর অবস্থা দেখে আর কথা শুনে সবাই থ হয়ে গেল।

প্যাটরা খুলে সুখু কোনো তুলাও পেল না।

অর্থ জেনে নিই

এক ছড়া কলা	—	এক কাঁদি কলা।
থ হয়ে যাওয়া	—	অবাক হয়ে যাওয়া।
পঙ্খিরাজ ঘোড়া	—	উড়তে পারে এমন কাল্পনিক ঘোড়া।
পেট ঢোল করে খাওয়া	—	অতিরিক্ত খেয়ে পেট ফুলানো।
প্যাটরা	—	ছোট বাক্স।
মঁলাঁম	—	মরে গেলাম।
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে	—	খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

অনুশীলনী

১. ‘কাটা’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ পড়ি।

এই গাছটা কেটো না।	কর্তন করা
শ্রমিকেরা পুকুর কাটছে।	খনন করা
ভালোই তো সময় কাটছে!	অতিবাহিত হওয়া
বিপদ কেটে গেল।	দূর হওয়া
দুখু চরকায় সুতা কাটছে।	তৈরি করা
তিনি পুকুরে সাঁতার কাটছেন।	ভেসে এগিয়ে যাওয়া
মা সিলেট যাওয়ার টিকিট কেটেছেন।	ক্রয় করা

২. প্রশ্ন তৈরি করি, উত্তর শুনি।

‘সুখু আর দুখু’ গল্প পড়ে প্রশ্ন তৈরি করো। এরপর সহপাঠীকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে উত্তর শোনো।

ক. ....

খ. ....

গ. ....

ঘ. ....

ঙ. ....

চ. ....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাড়িতে সুখু ও দুখু কী কী কাজ করে তা লিখি।

খ. বাতাসের সঙ্গে যেতে যেতে দুখু কাদের কী কী উপকার করল?

গ. চরকা কাটা বুড়ি দেখতে কেমন? সে কেমন বাড়িতে থাকে?

ঘ. দুখু বাড়িতে ফেরার সময় কলাগাছ ও ঘোড়ার কাছ থেকে কী উপহার পেল?

ঙ. সুখু কেন ভালো কিছু পেল না?

৪. দুটি বাক্য জোড়া দিয়ে এক বাক্য বানাই।

ক. দুখু তুলা রোদে দিয়েছে। তারপর উঠানে বসে আছে।

দুখু তুলা রোদে দিয়ে উঠানে বসে আছে।

খ. দুখু ঘোড়ার কথা শুনল। তারপর তাকে কচি ঘাস এনে দিলো।

....

গ. আমি তোমার সাথে শিউলিতলায় যাব। তারপর ফুল কুড়াব।

....

ঘ. তিনি তোমার কথা শুনেছেন। তিনি একটি বই কিনে এনেছেন।

....

ঙ. পাখিরা খড়কুটা নিয়ে এলো। তাদের বাসা বানাল।

....

৫. ভালো কাজের তালিকা করি।

মানুষের জন্য করতে পারি এমন তিনটি কাজ লিখি।

ক. ....

খ. ....

গ. ....

৬. শিক্ষকের সহায়তায় 'সুখু আর দুখু' গল্পটি অভিনয় করি।

পাঠ ৭

সাইক্লোন

শামসুর রাহমান

চাল উড়ছে, ডাল উড়ছে
উড়ছে গরু, উড়ছে মোষ।
খই উড়ছে, বই উড়ছে
উড়ছে পাঁজি, বিশ্বকোষ।

ময়লা চাদর, ফরসা জামা,
উড়ছে খেতের সরষে, যব।
লক্ষ্মীপ্যাঁচা, পক্ষীছানা
ঘুরছে, যেন চরকি সব।

মাছ উড়ছে, গাছ উড়ছে
ঘূর্ণি হাওয়া ঘুরছে জোর।
খাল ফুলছে, পাল ছিঁড়ছে
রুখবে কারা পানির তোড়?

হারান মাঝি, পরান শেখ
বাতাস ফুঁড়ে দিচ্ছে ডাক।
আকাশ ভেঙে কাচের গুঁড়ো
উঠল আজান, বাজল শাঁখ।

চম্পাবতীর কেশ ভাসছে
ভাসছে স্রোতে খড়ের ঘর।
শেয়াল কুকুর কুঁকড়ো শালিক
ডুবল সবই, ডুবল চর।

অর্থ জেনে নিই

কুঁকড়ো — মোরগ।
কেশ — চুল।
খড়ের ঘর — যে ঘরের চাল খড়ের তৈরি।
ঘূর্ণি হাওয়া — প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকা বাতাস।
চর — নদীর ভিতর থেকে জেগে ওঠা ভূমি।
চরকি — বাতাসে ঘোরে এমন খেলনা।
পক্ষীছানা — পাখির বাচ্চা।
পাঁজি — পঞ্জিকা; দিন, তারিখ ইত্যাদি হিসাবের বই।
পানির তোড় — পানির প্রবল বেগ।
ফরসা — সাদা।
বিশ্বকোষ — জ্ঞানের তথ্য যে বইয়ে অভিধানের মতো সাজানো থাকে।
যব — গমজাতীয় শস্য।
শাঁখ — শঙ্খ।
শর্ষে — সরিষা।

অনুশীলনী

১. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিশ্বকোষ : ....

ঘূর্ণি হাওয়া : ....

আকাশ ভেঙে : ....

ধোয়া জামা : ....

খড়ের ঘর : ....

২. যত পারি মিল-শব্দ তৈরি করি।

চাল : ....

খই : ....

গরু : ....

মোষ : ....

জোর : ....

ছানা : ....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে?

খ. ঝড়ে কী কী উড়ছে তার তালিকা তৈরি করি।

গ. চম্পাবতীর কেশ জলে ভাসছে কেন?

ঘ. আজান দেওয়া ও শাঁখ বাজানোর কথা বলা হচ্ছে কেন?

৪. সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে একসাথে কবিতাটি পড়ি।

৫. কবিতার কাজ-শব্দগুলো আলাদা করি এবং সেগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

ওড়া : ....

.... : ....

.... : ....

.... : ....

.... : ....

.... : ....

৬. নিজের দেখা বা শোনা একটি দুর্যোগের বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখি।

পাঠ ৮

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু। এ দেশের মানুষের কাছে এটি বাঘ নামে পরিচিত। বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমন ভয়ংকর এর আচরণ। বাংলাদেশের সুন্দরবনে এই প্রাণী দেখা যায়। পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির বাঘ আছে। কিন্তু রয়েল বেঙ্গল টাইগার সবচেয়ে রাজসিক।

বাঘের গায়ের রং হলুদ থেকে গাঢ় কমলা হয়ে থাকে। এর গায়ে কালো রঙের ডোরাকাটা দাগ আছে। বাঘের পেটের দিকটা সাদা। একটি বাঘের দৈর্ঘ্য ২২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর লেজ ৬০ থেকে ১১০ সেন্টিমিটার। কাঁধের দিকে বাঘের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটারের মতো। পুরুষ বাঘের গড় ওজন ২২০ কেজি, আর বাঘিনীর গড় ওজন ১৪০ কেজি।

বাঘ বিড়াল প্রজাতির সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। তাই বিড়ালকে বলা হয় বাঘের মাসি। বাঘ খুব দক্ষতার সঙ্গে শিকার ধরতে পারে। এদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর। বাঘের আছে

শক্তিশালী থাবা। থাবার নিচের অংশ নরম ও পুরু। তাই চলার সময় শব্দ হয় না। শিকার ধরার সময় থাবা থেকে নখর বেরিয়ে আসে। খাবার চিবানোর জন্য এদের রয়েছে তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁত আর মজবুত চোয়াল। একটি বাঘ সাধারণত প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ কেজি খাবার খায়। হরিণ, শূকর, বানরের মাংস ইত্যাদি বাঘের প্রধান খাদ্য।

বাঘ খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে। বলা হয়ে থাকে, সে নদী বা খাল পার হওয়ার সময়ে ঠিক সোজাসুজি এগিয়ে যায়। যদি স্রোতের কারণে কিছুদূর সরে যায়, তবে আবার ঠিক আগের জায়গায় ফিরে আসে।

এরা সাধারণত ৩০ থেকে ৩৫ বছর বাঁচে। বাঘিনী তিন বছর অন্তর ৩-৪টি করে বাচ্চা দেয়। বাচ্চারা প্রায় এক বছর তাদের মায়ের সঙ্গে থাকে। একেকটি পুরুষ বাঘ বনের একটি নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে রাজত্ব করে। সেই রাজত্বে সে অন্য পুরুষ বাঘকে ঢুকতে দেয় না।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাঘের ভূমিকা আছে। যেমন– বাঘের কারণে মানুষ সুন্দরবনে ঢুকতে ও বনের গাছ কাটতে ভয় পায়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে বাঘের জীবন বিপন্ন হয়। তাছাড়া কিছু লোক চামড়া ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গের লোভে বাঘ মেরে ফেলে। তাই সুন্দরবনে দিন দিন বাঘের সংখ্যা কমছে।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীতে বাংলাদেশের পরিচিতি ও গৌরব বাড়িয়েছে এই প্রাণী। আমাদের দায়িত্ব সুন্দরবনকে রক্ষা করা। না হলে বাঘ বাংলাদেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

অর্থ জেনে নিই

ঘ্রাণশক্তি	—	গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা।
চিরতরে	—	চিরকালে জন্য।
থাবা	—	কোনো জন্তুর সামনের পায়ের নখযুক্ত তালু।
দৃষ্টিশক্তি	—	দেখার ক্ষমতা।
পরিবেশের ভারসাম্য	—	পরিবেশের উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য।
প্রখর	—	তীব্র।
প্রত্যঙ্গ	—	শরীরের অংশ।
বিপন্ন	—	সংকটে পড়েছে এমন।
রাজসিক	—	রাজার মতো।
শ্রবণশক্তি	—	শোনার ক্ষমতা।

অনুশীলনী

১. খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

প্রখর	রাজকীয়	ভারসাম্য	বিপন্ন	নখর	ক্ষিপ্র	নির্দিষ্ট

ক. বাঘটি .... গতিতে দৌড়ে শিকার ধরল।

খ. শিকার ধরার সময়ে বাঘের থাবা থেকে বেরিয়ে আসে ....।

গ. মেয়েটির স্মরণশক্তি ....।

ঘ. বাঘটি .... ভঙ্গিমায় বসে আছে।

ঙ. সুন্দরবন ধ্বংস হতে থাকলে বাঘের জীবন .... হবে।

চ. কাজটি .... সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।

ছ. পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে প্রকৃতির .... নষ্ট হচ্ছে।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম কী?

খ. কোন কোন বৈশিষ্ট্য বাঘকে দক্ষ শিকারি বানিয়েছে?

গ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার কমে যাওয়ার কারণ কী?

ঘ. বিড়ালকে বাঘের মাসি বলা হয় কেন?

ঙ. বাঘের সাঁতারের ব্যাপারে কী বলা হয়?

৩. পাঠ থেকে **কে, কী, কখন, কোথায়, কেন, কীভাবে** ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রশ্ন তৈরি করি।

কে : ....?

কী : ....?

কখন : ....?

কোথায় : ....?

কেন : ....?

কীভাবে : ....?

৪. বিপরীত শব্দ লিখি এবং সেই শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
নরম	....	....
সুন্দর	....	....
সোজা	....	....
তীক্ষ্ণ	....	....
মজবুত	....	....

৫. চারপাশে কোন কোন পশুপাখি দেখি, তার একটি তালিকা করি।

৬. ছবি দেখে অনুচ্ছেদ লিখি।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

পাঠ ৯

টুকটুক ও চিকু

সেদিন টুকটুক স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছিল। মনে তার আনন্দের জোয়ার বইছে। কারণ, আগামীকাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু। দুই দিন পর মামাতো ভাইবোনেরা আসবে তাদের বাড়িতে। কী যে মজা হবে! খুশিতে ঝলমল করে উঠল টুকটুকের মুখটা ।

গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল, 'আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,

আজ আমাদের ছুটি।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে টুকটুক হঠাৎ মিঁউ মিঁউ শব্দ শুনতে পেল। কৌতূহলী চোখে সে এদিক–ওদিক তাকালো। শব্দ শুনে এগিয়ে যেতেই টুকটুক বাগানের কোণে একটা বিড়ালছানা দেখতে পেল। ছানাটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছে। কাদামাটি মাখা কঙ্কালসার শরীর নিয়ে মিঁউ মিঁউ করে ডাকছে। মনে হচ্ছে, তার একটা পা কেটে গেছে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে টুকটুক চারদিকে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না।

টুকটুক এবার বিড়ালছানাটির কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি একা? ভয় পেয়েছ?' বিড়ালছানাটি মুখ তুলে তাকাল, চোখে যেন পানি। টুকটুকের মন বিড়ালছানার জন্য কেঁদে উঠল। সে ছানাটিকে আলতো করে কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে এলো।

দরজায় পা দিয়েই সে মা মা বলে ডাকতে থাকল। মা বিচলিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। মা দেখলেন, টুকটুক একটি বিড়ালছানা কোলে নিয়ে আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে। আর্তস্বরে বিড়ালটি তখনও কাঁদছে। মাকে দেখে টুকটুক বলল, 'মা, আমি কি বিড়ালছানাটির একটু যত্ন নিতে পারি?' মা একটু চিন্তিত হলেন। তারপর বললেন, 'বিড়ালের যত্ন নেওয়া কিন্তু কঠিন কাজ।'

টুকটুক বলল, 'মা, আমিই সব করব। তুমি শুধু আমাকে একটু সাহায্য করবে। সুস্থ হয়ে উঠলেই ছানাটি আবার হাসবে, দেখো।'

মা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, চেষ্টা করো।'

টুকটুক নরম তোয়ালে দিয়ে বিড়ালছানাটির গা মুছিয়ে দিলো। পায়ের কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিলো। মা একটা ছোট পাত্রে দুধ দিলেন। বিড়ালছানাটি ধীরে ধীরে দুধ খেল। একটু পর ছানাটি টুকটুকের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।

টুকটুক ওর নাম রাখল 'চিকু'।

চিকু দিনে দিনে সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। ও টুকটুকের পেছন পেছন ঘুরত, রাতে বিছানায় এসে পাশে ঘুমাত। আর সারাদিন চলত তার লম্ফঝম্প। এর মধ্যে এলো টুকটুকের মামাতো ভাইবোন রাতুল ও নীলা। ওরা চড়ুইভাতির আয়োজন করল। ওদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যোগ দিল চিকু। গ্রীষ্মের ছুটির কয়েকটা দিন চিকুকে নিয়ে বেশ আনন্দেই কাটলো ওদের।

একদিন টুকটুক খেলতে গিয়ে দেখল, কয়েকটা ছেলে রাস্তায় একটা বিড়ালছানাকে তাড়া করছে। সে দৌড়ে গিয়ে তাদের থামালো।

টুকটুক বলল, 'ওরা তো ছোট্ট প্রাণী। তোমরা ওকে মারছো কেন?'

একটা ছেলে বলল, 'আমরা তো মজা করছি।'

টুকটুক রাগ করে বলল, 'কেউ তোমাদের এভাবে তাড়া করলে কেমন লাগত?'

ছেলেরা চুপচাপ চলে গেল। টুকটুক বিড়ালছানাটিকে কোলে তুলে মাঠের পাশে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলো। তখন বিড়ালছানাটি মিঁউ মিঁউ করে ডেকে উঠল, যেন বলছে, 'ধন্যবাদ বন্ধু!'

এরপর থেকে টুকটুক আশপাশের অন্য পশুপাখির প্রতিও বেশ যত্নবান হয়ে উঠল। পাখিদের জন্য সে প্রতিদিন জানালার ধারে এক মুঠো ভাত রেখে দেয়। গ্রীষ্মের দাবদাহে বাটি ভরে পানি রেখে দেয়। পাখিরা যেন পানি খেতে পারে।

সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে টুকটুক 'প্রাণীদের বন্ধু' নামে ছোটখাটো একটা ক্লাবও বানিয়ে ফেলল। এই কাজে শ্রেণিশিক্ষক তাদের সহযোগিতা করলেন।

মা একদিন বললেন, 'তুমি একটা বিড়ালকে ভালোবেসে অনেক কিছু শিখে গেলে!'

টুকটুক হেসে বলল, 'ও তো শুধু একটা প্রাণী নয় মা, আমার বন্ধুও। আর বন্ধুর বিপদে পাশে দাঁড়ানোই তো সত্যিকারের ভালোবাসা।'

অর্থ জেনে নিই

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে	—	আনন্দমুখর পরিবেশে।
আর্তস্বর	—	ব্যথাসূচক শব্দ; কাতরধ্বনি।
আলতো করে	—	আলগোছে।
কঙ্কালসার	—	শরীরে হাড় ছাড়া কিছু নেই এমন; রোগা।
গ্রীষ্মের দাবদাহে	—	গরমকালের প্রচণ্ড তাপে।
চড়ুইভাতি	—	বনভোজন।
ভয়ে জড়োসড়ো	—	ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া।
হৃষ্টপুষ্ট	—	মোটাতাজা।

অনুশীলনী

১. ডান পাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য লিখি।

ক. মনে তার .... বইছে।	জড়োসড়ো
খ. টুকটুকের মুখটা হাসিতে ....করে উঠল।	ঝলমল
গ. ছানাটি ভয়ে .... হয়ে কাঁপছে।	আলতো
ঘ. চড়ুইভাতির .... যোগ দিল চিকু।	আনন্দের জোয়ার
ঙ. সে ছানাটিকে ....করে কোলে তুলে নিল।	আনন্দ-উচ্ছ্বাসে

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. টুকটুক গান গেয়ে উঠল কেন?

খ. টুকটুক কোথায় বিড়ালছানাটিকে দেখতে পেল?

গ. টুকটুকের মন বিড়ালছানাটির জন্য কেঁদে উঠল কেন?

ঘ. টুকটুক কীভাবে বিড়ালছানাটির যত্ন নিল?

ঙ. অন্য পশুপাখির যত্নে টুকটুক কী কী করত?

চ. ‘প্রাণীদের বন্ধু’ ক্লাবটি কীভাবে গঠিত হয়েছিল?

৩. সঠিক উত্তরসহ বাক্যটি লিখি।

ক. টুকটুকের মামাতো ভাইবোনেরা আসবে —

ঈদের ছুটিতে — শীতের ছুটিতে
গ্রীষ্মের ছুটিতে — পূজার ছুটিতে

খ. ছানাটি জড়োসড়ো হয়ে—

খিদেয় কাঁপছে — ভয়ে কাঁপছে
ঠান্ডায় কাঁপছে — জ্বরে কাঁপছে

গ. টুকটুক বিড়ালছানাটির গা মুছিয়ে দিল—

গামছা দিয়ে — কাপড় দিয়ে
জামা দিয়ে — তোয়ালে দিয়ে

ঘ. বিড়ালছানার নাম ‘চিকু’ রেখেছে —

রাতুল — নীলা
টুকটুক — মা

ঙ. চড়ুইভাতির আয়োজন করল—

টুকটুক ও নীলা — টুকটুক, রাতুল ও নীলা
রাতুল ও নীলা — টুকটুক ও রাতুল

৪. কোন বাক্যে **বিবরণ, প্রশ্ন, বিস্ময়** বোঝাচ্ছে তা ডান পাশে লিখি।

ক. আগামীকাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু। ....

খ. ভয় পেয়েছ? ....

গ. অনেক কিছু শিখে গেলে। ....

ঘ. টুকটুক ওর নাম রাখল ‘চিকু’। ....

ঙ. সত্যি, মাগো! ....

চ. কেন পারবি না? ....

৫. বাক্যের শেষে দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন অথবা বিস্ময়চিহ্ন বসিয়ে পুনরায় লিখি।

ক. টুকটুক স্কুলে পড়ে :

খ. তোমরা ওদের মারছো কেন :

গ. কী সুন্দর লাগছে চারদিক :

ঘ. আহারে, ওর কত কষ্ট :

ঙ. তুমি কি তার নাম জানো :

চ. এক্ষুনি চলে আসো :

৬. গল্পটি শেষ করি।

ছুটির দিন। খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, জানালায় একটা পাখি বসে আছে। আমি পাখিটাকে বললাম, ‘তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?’

....

....

....

....

....

....

....

৭. আমার প্রিয় কোনো প্রাণী নিয়ে একটি রচনা লিখি।

পাঠ ১০

রাখাল ছেলে

জসীমউদ্‌দীন

‘রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও।
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?’

‘ওই যে দেখো নীল-নোয়ানো সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবির রঙে নাওয়া;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না!’

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! আবার কোথা ধাও,
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।'
'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া ভাই,
সরষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু-খান পা,
বলছে ডেকে, 'গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!'
সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে ভাই!
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই!'

অর্থ জেনে নিই

আবির রং	—	লালচে রং।
কুটির	—	কুঁড়েঘর।
কোথা ধাও	—	কোথায় ছুটে চলেছ?
চামর	—	পাখা।
নাও	—	নৌকা।
নীল-নোয়ানো	—	নীল আকাশ নেমে এসেছে এমন।
প্রভাত হাওয়া	—	সকাল বেলার বাতাস।
বাঁকা গাঁয়ের পথ	—	গ্রামের বাঁকা রাস্তা।
বারেক	—	একবার মাত্র।
মিঠেল রোদ	—	কোমল রোদ।
সবুজ ঘেরা গাঁ	—	সবুজ গাছগাছালিতে ভরা গ্রাম।
সাঁঝ-আকাশ	—	সন্ধ্যার আকাশ।
সোনার পাতায় ছাওয়া	—	শুকনা সোনালি পাতা দিয়ে ঢাকা।

অনুশীলনী

১. বাক্য তৈরি করি।

একলা ঘরে : ....

রঙিন মেঘ : ....

কলার পাতা : ....

শিশির-ঝরা : ....

ছোটো কুটির : ....

২. মিল-শব্দ লিখি।

চাও : ....

ডাকছে : ....

জেগে : ....

হাসে : ....

জড়িয়ে : ....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. রাখাল ছেলে কেমন পথ ধরে, কোথায় যাচ্ছে?

খ. গ্রামটিকে ‘সবুজ ঘেরা’ বলা হয়েছে কেন?

গ. রাখাল ছেলে কেন মায়ের কাছে যেতে চায়?

ঘ. কবিতা থেকে গ্রামের সকালের বিবরণ দাও।

ঙ. কবিতার প্রকৃতির সাথে আমার চারপাশের প্রকৃতির তুলনা করি।

৪. এক শব্দে উত্তর দিই।

গাঁয়ের পথটি কেমন? : ....

কুটিরটি কেমন? : ....

সকালের রোদটা কেমন? : ....

কোন আকাশে রঙিন মেঘ দেখা যাচ্ছে? : ....

ঘুম থেকে ওঠার পর কেমন ঘাস দেখা যায়? : ....

৫. কবিতাটি দুজনে মিলে আবৃত্তি করি।

৬. কবিতায় যেসব জিনিসের কথা আছে সেগুলোর রং লিখি।

কলার পাতা	সবুজ
গাঁয়ের পথ	....
....	....
....	....
....	....
....	....

পাঠ ১১

কুটির শিল্প

তোমরা তো বেতের ঝুড়ি, মাটির হাঁড়ি, পাটের শিকা দেখেছ। একসময় বাংলাদেশের গ্রামের কুটিরে এসব জিনিস হাতে বানানো হতো। তারপর সেগুলো বিক্রি করা হতো বাজারে বা মেলায় নিয়ে। কুটিরে তৈরি হতো বলে এসব জিনিসকে বলা হয় কুটির পণ্য। কুটির পণ্যের মধ্যে আরো আছে জামদানি শাড়ি, তাঁতের শাড়ি, শীতলপাটি, শতরঞ্জি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, গয়না। এসব পণ্যকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে বলা হয় কুটির শিল্প।

ইবনে বতুতা চৌদ্দ শতকে বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণে বাংলার সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের কথা আছে। এখন কুটির পণ্য শুধু কুটিরে তৈরি হয় না। কারখানাতেও এসব জিনিস তৈরি করা হয়। এ দেশের কুটির শিল্পের কোনো কোনো পণ্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিল। যেমন– মসলিন কাপড়। সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বানানো হতো মসলিন। মোগল বাদশাহ-বেগমরা মসলিন কাপড় ব্যবহার করতেন। মসলিন কিনে নিয়ে যেতেন আরব ও ইউরোপের বণিকেরা।

বাংলাদেশে অনেক ধরনের কুটির পণ্য রয়েছে। যেমন– মাটি দিয়ে বানানো হয় থালা-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল, হাতি-ঘোড়া, পুতুল। বেড়া, ঝুড়ি, কুলা, চালুনি ও মোড়া তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় বাঁশ। বেত দিয়ে বানানো হয় চেয়ার, টেবিল, দোলনা, বই রাখার তাক, ধামা। বস্তা, দড়ি, পাপোশ, শিকা প্রস্তুত করা হয় পাট দিয়ে। সোনা-রুপা দিয়ে বানানো হয় কানের দুল, গলার মালা, হাতের চুড়ি। কাঁসা-পিতল দিয়ে বানানো হয় তৈজসপত্র।

তাঁতে তৈরি করা কাপড় কুটির শিল্পের আরেকটি নমুনা। কলকারখানা আবিষ্কারের আগে এ দেশের মানুষ তাঁতে বোনা কাপড় পরত। এখনও তাঁতিরা শাড়ি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা ইত্যাদি তৈরি করেন। তাঁতে তৈরি জামদানি শাড়ি বাংলাদেশের নিদর্শন হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত।

খেজুরপাতা ও বেতের চটা দিয়ে পাটি বানানো হয়। এসব পাটি বসার আসন বা মাদুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের বিশেষ একধরনের পাটির নাম শীতলপাটি। চিকন বাঁশের মতো দেখতে মুর্তা গাছ দিয়ে বানানো হয় শীতলপাটি । শীতলপাটিও বাংলাদেশের নিদর্শন হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।

বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প নকশিকাঁথা। গ্রামের নারীরা মেঝেতে কাপড় পেড়ে কাঁথা বানাত। তারপর সেই কাঁথায় নকশা করে ফুল, লতা, পাতা এঁকে তৈরি করত নকশিকাঁথা।

তালপাতা, বাঁশ ও বেতের চটা, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে হাতপাখা বানানো হয়। গরমে শরীরকে শীতল করে পাখার বাতাস।

কুটির পণ্যগুলো আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে এসব পণ্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গৃহসজ্জায় কুটির পণ্যের সমাদর লক্ষ করা যায়। নাগরিক মানুষের প্রবল চাহিদার কারণে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে কুটির পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

অর্থ জেনে নিই

ইবনে বতুতা	—	মরক্কোর একজন ভ্রমণকারী।
কুলা	—	ধান, চাল ইত্যাদি ঝাড়ার ডালা।
চটা	—	বাঁশের পাতলা ফালি।
চালুনি	—	ছাঁকার কাজে লাগে এমন ছিদ্রযুক্ত পাত্র।
তৈজসপত্র	—	ধাতুর তৈরি থালা-বাসন।
দৈনন্দিন	—	প্রতিদিনের।
ধামা	—	বেতের ঝুড়ি।
নিদর্শন	—	নমুনা।
বণিক	—	ব্যবসায়ী।
মোড়া	—	বাঁশ বা বেত দিয়ে তৈরি বসার নিচু আসন।
শতরঞ্জি	—	হাতে বোনা কার্পেট।
সমৃদ্ধ	—	উন্নত।
সূক্ষ্ম	—	মিহি।

অনুশীলনী

১. শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি।

কুটির : ....

সমৃদ্ধ : ....

সূক্ষ্ম : ....

তৈজসপত্র : ....

নিদর্শন : ....

মোড়া : ....

কুলা : ....

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কুটির শিল্প কাকে বলে?

খ. ইবনে বতুতা কে? তিনি কোন সময়ে বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন?

গ. বাংলাদেশের নিদর্শন হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে কোন কোন পণ্য?

ঘ. নকশিকাঁথা কীভাবে তৈরি করা হয়?

ঙ. কুটির পণ্য কোন কাজে লাগে?

চ. আমার বাড়িতে কী কী কুটির পণ্য আছে তার তালিকা করি।

৩. একটি বাক্য ভেঙে দুটি বাক্য বানাই।

ক. ইবনে বতুতা বাংলাদেশে ঘুরে সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের কথা লিখেছেন।

....

খ. কুটির পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এর সমৃদ্ধি ঘটতে পারে।

....

গ. আমি বৈশাখী মেলায় গিয়ে নানা রকম কুটির পণ্য দেখেছি।

....

ঘ. কুটির শিল্পে পুঁজি কম লাগে এবং স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়।

....

ঙ. হাতপাখাটি দামে সস্তা হলেও ভালো বাতাস দেয়।

....

৪. কুটির পণ্যের নাম ও ব্যবহার লিখি।

পণ্যের নাম	যে কাজে লাগে

৫. পেশার নাম লিখি।

যারা চাষ করে : ....

যারা মাছ ধরে : ....

যারা নৌকা চালায় : ....

যারা লোহা দিয়ে জিনিস বানায় : ....

যারা মাটি দিয়ে জিনিস বানায় : ....

যারা তাঁতে কাপড় বোনে : ....

যারা গাড়ি চালায় : ....

যারা চাকরি করে : ....

যারা শিক্ষকতা করে : ....

যারা সোনার গয়না বানায় : ....

৬. কাজ বোঝায় এমন শব্দ বাছাই করে লিখি।

নবীন তার মামা-মামির সঙ্গে মেলায় এসেছে। সে মামার হাত ধরে রেখেছে। মেলায় অনেক রকম জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে। এগুলো দেখে তার ভালো লাগছে। হঠাৎ মামি বললেন, 'নবীন, নাগরদোলায় চড়বে?' নবীন মাথা নাড়িয়ে সায় জানাল। মামা দশ টাকা দিয়ে টিকিট কাটলেন। নবীন ভয়ে ভয়ে নাগরদোলায় চড়ল। চরকির মতো ঘুরতে লাগল নাগরদোলা।

....

....

....

....

....

....

পাঠ ১২

শিষ্যের সাধনা

নাম তার একলব্য। সারাদিন তির-ধনুক নিয়ে মেতে থাকে ছেলেটা। অব্যর্থ তার হাতের নিশানা।

একলব্য মস্ত বীর হতে চায়। তাই একদিন সে ছুটল গুরু দ্রোণের কাছে। একলব্য শুনেছে, দ্রোণ রাজপুত্রদের তির চালনা শেখান। তাঁর কাছে শিখতে পারলে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

সাহসে বুক বেঁধে একলব্য ঢুকে পড়ল রাজবাড়ির মাঠে। সেখানে রাজপুত্ররা ধনুক থেকে তির ছোড়ার অনুশীলন করছে। তাদের গুরু দ্রোণ একদিকে বসে আছেন। একলব্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের তির ছোড়া দেখতে লাগল। তার সাহস হলো না গুরুর কাছে যেতে।

হঠাৎ এক রাজপুত্র দেখতে পেল একলব্যকে। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুমি কে? কোত্থেকে এসেছ?'

একলব্য চুপ করে থাকল।

এবার দ্রোণ তাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'কে তুমি? কী চাও এখানে?'

একলব্য কাছে এসে বলল, 'আমি এক শিকারির ছেলে। নাম একলব্য।'

দ্রোণ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা এখানে কেন?'

ভয়ে ভয়ে একলব্য বলল, 'আমি আপনার কাছে তির চালনা শিখতে চাই।'

বিরক্ত মুখে দ্রোণ বললেন, 'শোনো বাছা। আমি শুধু রাজকুমারদের শেখাই। তুমি ফিরে যাও।'

একলব্যের মুখ কালো হয়ে গেল। সে মলিন মুখে সেখান থেকে চলে এলো। তারপর ভাবল, এখন থেকে সে নিজেই তির চালনার অনুশীলন করবে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। রাজপুত্ররা অনেক বড়ো হয়েছে। তির-ধনুক চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে সবাই। দ্রোণ একদিন তাদের পরীক্ষা নিতে বনে এলেন।

রাজপুত্রদের মধ্যে তৃতীয় জন সবচেয়ে ভালো তির নিক্ষেপ করতে পারে। সে একটা হরিণ দেখে তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ হরিণটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। রাজপুত্র সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার সঙ্গে ছিল একটা শিকারি কুকুর। কুকুরটা হরিণের পিছু ছুটল।

খানিক বাদে তৃতীয় রাজপুত্র থ হয়ে গেল। তার শিকারি কুকুর ফিরে এসেছে। তবে কুকুরটার মুখের চারপাশে বিঁধে রয়েছে পাঁচটা তির। এ কারণে কুকুরটা আর ডাকতে পারছে না। কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! কুকুরটার মুখে এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই। যন্ত্রণার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

কে এমন আশ্চর্যভাবে তির মারল কুকুরটাকে? তৃতীয় রাজপুত্র এবার সেই শিকারিকে খুঁজতে শুরু করল।

খুঁজতে খুঁজতে বনের এক জায়গায় দেখতে পেল, উঠানের মতো একফালি জায়গা। তার চারপাশে লতাপাতার বেড়া। সেখানে তির চালনার অনুশীলন করছে এক যুবক। কোনো দিকে তার খেয়াল নেই। তৃতীয় রাজপুত্র অবাক হয়ে তার অনুশীলন দেখতে লাগল। কী দারুণ কৌশলে সে তির মারতে পারে!

এতদিন তৃতীয় রাজপুত্র তির চালনায় নিজেকে সেরা মনে করত। এখন নিজের অহংকার ধুলায় মিশে গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, ‘তুমি কি আমার কুকুরের মুখে এমন করে তির মেরেছ?’

যুবক মুখ ঘুরিয়ে রাজপুত্রের দিকে তাকাল। তারপর নির্বিকার মুখে বলল, ‘হ্যাঁ, আমি।’

রাজপুত্র বলল, ‘কিন্তু কেন?’

যুবক শান্তভাবে বলল, ‘তোমার কুকুর চিৎকার করে আমার সাধনার ব্যাঘাত করছিল। তবে আমি ওর কোনো ক্ষতি করিনি। তাকে কোনো কষ্টও দিইনি। শুধু ওর চিৎকার বন্ধ করে দিয়েছি।’

রাজপুত্র জানতে চাইল, ‘তুমি কার কাছে এভাবে তির ছোড়া শিখেছ?’

‘গুরু দ্রোণের কাছে।’ উত্তর দিলো সে।

‘দ্রোণ!’ নাম শুনে চমকে উঠল রাজপুত্র। তাদের গুরু দ্রোণ। কিন্তু এমন বিদ্যা তো দ্রোণ তাকে শেখাননি! তৃতীয় রাজপুত্র সেখান থেকে বেরিয়ে দ্রুত গুরুর কাছে ফিরে এলো।

দ্রোণ আর অন্য রাজপুত্ররা তখন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তৃতীয় রাজপুত্রের চোখেমুখে রাগ দেখে দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হয়েছে, রাজপুত্র?’

রাজপুত্র কুকুরটাকে এনে দেখাল। তারপর বলল, ‘এমন করে তির মারা শিখিয়েছেন কাকে? এতদিন তো আপনিই বলতেন আমি পৃথিবীর সেরা তিরন্দাজ।’

দ্রোণ কুকুরটার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ‘রাজপুত্র, এমন আশ্চর্য বিদ্যা আমি নিজেই জানি না। অন্যকে শেখাব কী করে?’

তৃতীয় রাজপুত্র এবার গুরুকে নিয়ে গেল। সেই যুবকের কাছে। দ্রোণকে দেখে তির-ধনুক ফেলে ছুটে এলো যুবক। পায়ের ধুলা নিয়ে বলল, ‘আমি আপনার শিষ্য একলব্য।’

‘একলব্য!’ নাম শুনে দ্রোণের মনে পড়ল আগের ঘটনা। খানিক নীরব থেকে তিনি বললেন, ‘আমি তো তোমাকে শিষ্য বলে গ্রহণ করিনি। ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।’

একলব্য বলল, ‘সেদিন আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে মনে আপনাকে গুরু মেনে আমি এতদিন অনুশীলন করেছি।’

একলব্যের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন দ্রোণ। নিবিড় অনুশীলন একলব্যকে সেরা তিরন্দাজ বানিয়েছে।

অর্থ জেনে নিই

অব্যর্থ	—	বিফল হয় না এমন।
অহংকার	—	নিজেকে নিয়ে বড়াই।
একফালি	—	লম্বা এক টুকরা।
কৌশল	—	দক্ষতা; নিপুণতা।
চোখ কপালে উঠল	—	খুব অবাক হয়ে গেল।
তির চালনা	—	তির ছোড়া।
তিরন্দাজ	—	তির ছুড়তে পারদর্শী।
ধুলায় মিশে যাওয়া	—	শেষ হয়ে যাওয়া।
নিক্ষেপ	—	ছুড়ে মারা।
নির্বিকার	—	নির্লিপ্ত; পরিবর্তনহীন; আবেগহীন।
নিশানা	—	লক্ষ্য; তাক।
পারদর্শী	—	দক্ষ।
ব্যাঘাত করা	—	বাধা দেওয়া।
লক্ষণ	—	আভাস।
শিষ্য	—	গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে যে।
সাধনা	—	চেষ্টা; অভ্যাস।
হতভম্ব	—	অবাক; হতবাক।

অনুশীলনী

১. বন্ধনীর প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দিয়ে খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

ক. একলব্য .... বীর হতে চায়। (কেমন বীর?)

খ. দ্রোণ একদিন তাদের .... নিতে বনে এলেন। (কী নিতে)

গ. .... তার হাতের নিশানা। (কেমন নিশানা?)

ঘ. একলব্য ঢুকে পড়ল ....। (কোথায় ঢুকে পড়ল?)

ঙ. সে .... মুখে সেখান থেকে চলে এলো। (কেমন মুখে?)

চ. তিনি ছেলেটির দিকে .... তাকিয়ে রইলেন। (কীভাবে তাকিয়ে রইলেন?)

২. বিপরীত শব্দ লিখি এবং সেই শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
কাছে	....	....
মস্ত	....	....
পারদর্শী	....	....
ভিতরে	....	....
আগের	....	....

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. একলব্য কী হতে চায়?

খ. রাজবাড়ির মাঠে কে একলব্যকে কাছে ডাকলেন?

গ. একলব্যের মুখ কেন মলিন হয়ে গেল?

ঘ. তৃতীয় রাজপুত্রের অহংকার কেন ধুলায় মিশে গেল?

ঙ. কুকুরের মুখে কীভাবে তির মারা হয়েছিল?

চ. 'মনে মনে আপনাকে গুরু মেনে আমি এতদিন অনুশীলন করেছি।'—কথাটি কে, কাকে, কখন বলেছে?

৪. গল্পটির নাম 'শিষ্যের সাধনা' কেন, তা বলি ও লিখি।

৫. যেকোনো পাঁচটি শব্দের বদল ঘটিয়ে নিচের অংশটুকু আবার লিখি।

খুঁজতে খুঁজতে বনের এক জায়গায় দেখতে পেল, উঠানের মতো একফালি জায়গা। তার চারপাশে লতাপাতার বেড়া। সেখানে তির চালনার অনুশীলন করছে এক যুবক। কোনো দিকে তার খেয়াল নেই। তৃতীয় রাজপুত্র অবাক হয়ে তার অনুশীলন দেখতে লাগল। কী দারুণ কৌশলে সে তির মারতে পারে!

৬. ক্রমবাচক শব্দ শিখি।

১ম	প্রথম
২য়	দ্বিতীয়
৩য়	তৃতীয়
৪র্থ	চতুর্থ
৫ম	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	ষষ্ঠ
৭ম	সপ্তম
৮ম	অষ্টম
৯ম	নবম
১০ম	দশম

পাঠ ১৩

পাখির মতো

আল মাহমুদ

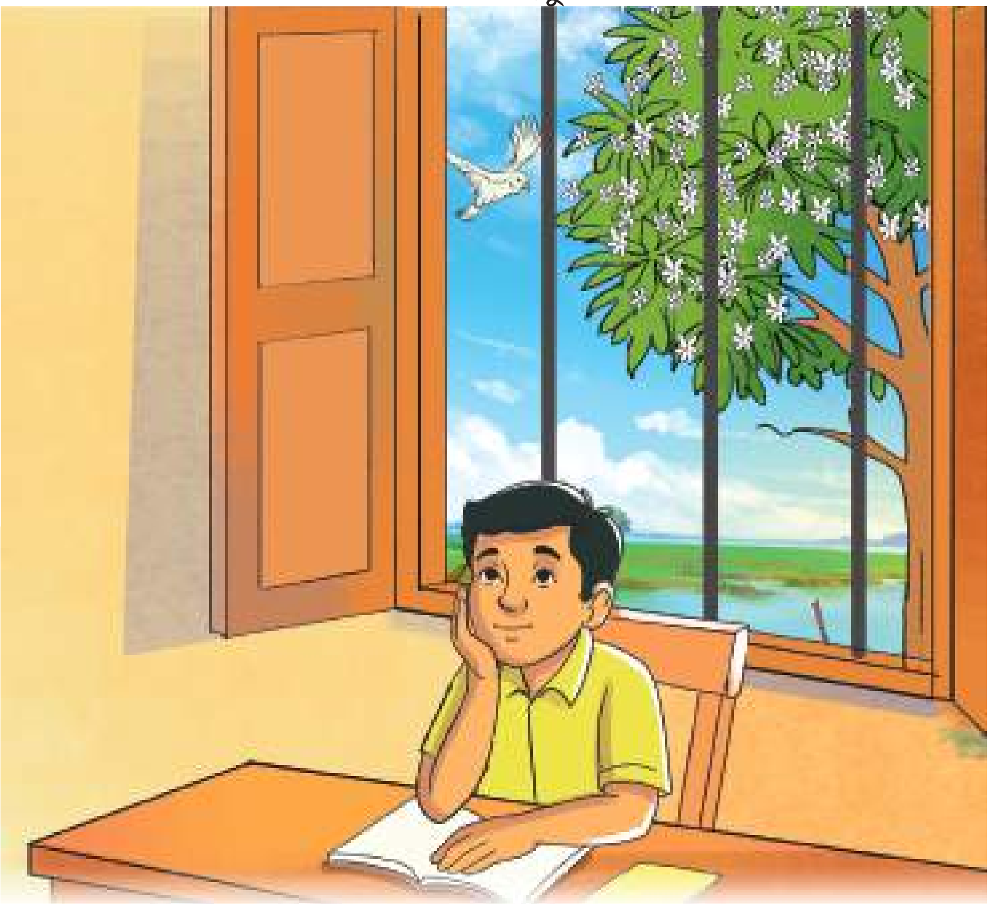

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে।
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠালচাঁপার গন্ধে।

আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে,
বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলীর কূলটায়,
দুধভরা ওই চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়।

তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়ব,
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরব!

তোমরা যখন শিখছ পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য,
আমি না হয় পাখিই হব,
পাখির মতো বন্য।

অর্থ জেনে নিই

কর্ণফুলী — একটি নদীর নাম।

কাঁঠালচাঁপা — হলুদ রঙের একধরনের ফুল।

দুধভরা ওই চাঁদের বাটি — পূর্ণিমার চাঁদকে বোঝানো হয়েছে।

বন্য — বুনো।

অনুশীলনী

১. শব্দের অর্থ লিখি এবং অর্থ দিয়ে নতুন বাক্য লিখি।

শব্দ	শব্দের অর্থ	বাক্য
গন্ধ	....	....
কূল	....	....
বন্য	....	....
গাঁ	....	....
ইচ্ছা	....	....

২. কবিতার লাইন সাজিয়ে লিখি।

এলোমেলো লাইন	সাজানো লাইন
দুধভরা ওই চাঁদের বাটি নদীর কাছে থাকতে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে আমার কেবল ইচ্ছে জাগে ফেরেস্তারা উল্টায়। বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে কর্ণফুলীর কূলটায়, পাখির মতো ডাকতে।	

৩. কবিতা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করি।

মন দে —— গন্ধে,

....

....

....

....

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সবাই কোথায় ঘুমিয়ে পড়ে?

খ. কে শহর ছেড়ে গাঁয়ে যেতে চায়?

গ. কবির কী কী করতে ইচ্ছা করে তার একটি তালিকা করি।

ঘ. কবি পাখির মতো বন্য হতে চান কেন?

ঙ. 'দুধভরা ওই চাঁদের বাটি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ, বিস্ময়, ইচ্ছা — কোন বাক্যটি কোন ভাবের তা ডানে লিখি।

ক. এক্ষুনি পড়তে বসো। ....

খ. আমি যদি সাঁতার কাটতে পারতাম! ....

গ. তুমি একা পুকুরে যেয়ো না। ....

ঘ. আর একটা গান গাও না! ....

ঙ. ফুলটার কী সুন্দর ঘ্রাণ! ....

চ. স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিয়ো। ....

৬. 'পাখির মতো' কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. আমার বাড়ির আশেপাশের বিভিন্ন গাছের একটি তালিকা তৈরি করি।

৮. ছকের ভিতর শব্দ খুঁজি।

ডা	কা	ঘু	ঘু	নি	শি	য়া	ল
ত	ন	দী	র	শ	মা	ন	ব
জা	গে	দা	বো	হ	নু	বা	ণ
ক	না	চ	ক	র	ষ	ব	লা
ট	সো	না	লি	ব	ন্য	ভা	ব
প	ভা	ত	চু	ফ	ল	গ	ণ্য

১. .... ২. .... ৩. ....

৪. .... ৫. .... ৬. ....

৭. .... ৮. .... ৯. ....

১০. .... ১১. .... ১২. ....

পাঠ ১৪

কুপোকাত

মুনীর চৌধুরী

চরিত্র

খরগোশ

বাঘ

শেয়াল

মোষ

শজারু

হরিণ

ময়ূর

[দৃশ্য: অরণ্য। এক পাশে মাটির ঢিবি। তার গায়ে স্তম্ভের আকারে ইষ্টক চিত্রিত। দেখে মনে হবে যেন একটা কুয়া, ঢিবির চূড়ায় তার মুখ।

ঘটনা: পশুদের জনসভা। আছে মোষ, ময়ূর, হরিণ, সজারু, শেয়াল ও খরগোশ। সভাপতি হলেন মোষ।]

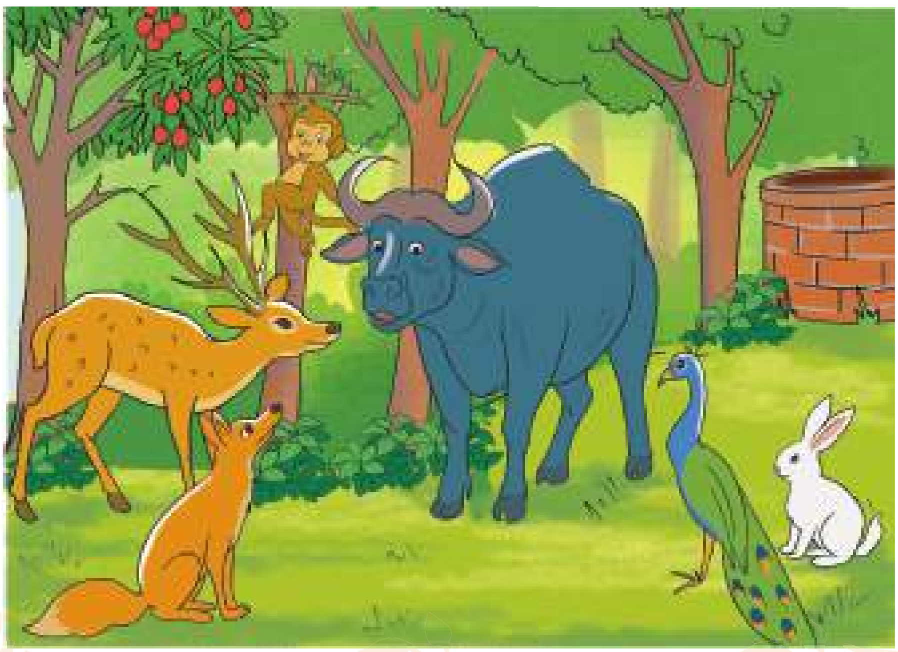

মোষ : [করতালি শেষ হলে] বড়োই পরিতাপের বিষয় যে, খরগোশ আমাদের সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হচ্ছে না। তাকে আমরা সকলে সাধ্যমতো বুঝিয়ে বলেছি। জাতীয় স্বার্থে সকলেরই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। খরগোশ অবুঝ। সে কেবল নিজের জীবনকেই বেশি মূল্যবান মনে করে। কে না জানে এক ভীষণ বাঘের অত্যাচারে আমাদের সকলের জীবন বিপন্ন। এই ভয়ানক ব্যাঘ্র প্রত্যহ নির্বিচারে বহু পশু হত্যা করে। কিছু খায়, কিছু ফেলে রাখে। আমাদেরই অনুরোধে শেয়াল বাঘের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা আপস-রফা করে। সেই অনুযায়ী স্থির হয় যে, অদ্য খরগোশ স্বেচ্ছায় মহামান্য বাঘের খাদ্য হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু খরগোশ এই প্রস্তাব মানতে অনিচ্ছুক। এখন উপায় কী? আমি আর একবার শেয়ালকে বলি, আপনাদেরও বলি, খরগোশকে বুঝিয়ে বলুন। তাকে রাজি করান।

শেয়াল : দেখো খরগোশ, আমি অনেক কষ্টে বাঘকে শান্ত করেছি। সে বলেছে যে তাকে যদি রোজ একটি করে পশু আমরা উপহার দেই, তবে সেদিন সে আর অকারণে অন্য প্রাণী হত্যা করবে না। আজ তুমি বীরের মতো সহাস্যে এগিয়ে যাও, কাল তোমার পথ অনুসরণ করে অন্যজন যাবে। সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে তোমার ইচ্ছে করে না?

খরগোশ : না। আমি অন্যের খাদ্য হতে চাই না। আমি নিজে খেতে চাই, বাঁচতে চাই।

শজারু : সে সকলেই চায়। কথা তা নিয়ে নয়। যেদিন আমার সময় আসবে, আমি পিছপা হব না। অবশ্য হয়তো আমাকে নির্বাচন করা কখনোই ঠিক হবে না। কারণ, আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা। চেহারাও বিদঘুটে। বাঘ হয়তো আমাকে দেখে, খাওয়ার বদলে ক্ষেপে যাবে। তাতে সকলের বিপদ আরো বেড়ে যেতে পারে। অবুঝ হোয়ো না। দেরি না করে বাঘের গুহায় চলে যাও।

মোষ : সজারু ঠিকই বলেছে। শেয়াল যা করে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করে।

ময়ূর : অবশ্য এর মধ্যে আরো একটু কথা আছে। সজারুর কথাও ঠিক, আবার তার উলটোটাও ঠিক।

শেয়াল : একটু পেখম ছড়িয়ে বলো, সবাই সহজে বুঝতে পারবে।

ময়ূর : মানে, কদাকার হওয়ার যেমন সুবিধা-অসুবিধা আছে, তেমনি বেশি সুন্দর হওয়ারও অসুবিধা অনেক। আমি সব সময়ই যেতে রাজি আছি। যেদিন সকলে আমার যাওয়া স্থির করবেন, আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে আমি লক্ষ করেছি, আমাকে সামনে পেলে

সবাই খাওয়ার কথা ভুলে যায়। আমার শোভায় মুগ্ধ হয়। বেশি সুন্দর বলে কেউ খেতে চায় না। আমাকে খাওয়া চলে না বলে মনে করে। বাঘ তা পছন্দ না-ও করতে পারে। তাতেও সকলের বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

হরিণ : কথা বাড়াস নে খরগোশ। লক্ষ্মী ভাই, তোর লেজে পড়ি, এবার যা তুই!

মোষ : বেলা বেড়ে যাচ্ছে। বাঘ নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। আর বেশিক্ষণ এখানে সমবেতভাবে থাকা মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না।

শেয়াল : সভাপতি সাহেব, সভা ভেঙে দিন। গর্জন শোনা যাচ্ছে। হয়তো এখানেই এসে পড়বে। খরগোশ না যেতে চায় এখানেই থাকুক। আপনি সভা ভেঙে দিন। আমরা বিদায় হই।

মোষ : সভা ভঙ্গ। বিদায়, বিদায়, বিদায়!

[খরগোশ ব্যতীত অন্য সকলের দ্রুত প্রস্থান।]

খরগোশ : (একাকী)

কত গাজর কত মুলো কত না সুন্দর এই পৃথিবী,
স্বপ্নের মতো কচি কচি কত সবুজ ঘন বাঁধাকপি।
মরিতে চাহি না অল্প বয়সে,
চাহি না কো যেতে বাঘের গ্রাসে।
যে করে পারি রহিব আঁকড়ি লইব মাটির সুরভি,
আহা, কত গাজর, কত মুলো, কত না সুন্দর এই পৃথিবী।

[চিন্তাযুক্তভাবে পদচারণা।]

সকলে বলে
ভেজিটেবিলে
শক্তি বাড়ে বুদ্ধি গজায়!
ও ভাই পালং
ও ভাই মুলো
শীঘ্র বলো মুক্তি উপায়।

গাজর কপি

মটরশুঁটি

খেয়েছি রোজ মজায় মজায়;

তবু কি আজ

হবে না কাজ

বিপদ যখন নাকের ডগায়?

[প্রাণপণে কাঁচা তরকারি চিবিয়ে খায় এবং চিন্তা করে। হঠাৎ উল্লসিত হয়ে।]

পেয়েছি পেয়েছি পেয়ে গেছি ভাই, বুদ্ধি, ফুর্তি, ফুর্তি।

এখনি দেখিবে, কেমনে হবে কার্য সিদ্ধি, ফুর্তি ফুর্তি।

[নেপথ্যে বাঘের গর্জন।]

বাবারে বাবা, কাঁপিছে প্রাণ, হাঁকিছে বজ্রনির্ঘোষ।

দেখিয়া দেরি আসিছে স্বয়ং, খেপেছে বেটা রাক্ষস।

এখনই বুঝি, প্রবেশে আসি, তুলিয়া ধরিবে থাবা।

আসলে ফাঁকি, সকলই ভান, সাজিতে হবে গো হাবা।

[খরগোশ মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকে। বাঘের প্রবেশ।]

বাঘ : আমি ক্ষুধার্ত। কথা ছিল সূর্য খাড়া মাথার উপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুপুরের খাদ্য আমার সামনে হাজিব হবে। হয়নি কেন?

খরগোশ : হুজুর, হাজির হলাম!

বাঘ : কিন্তু দেরি হলো কেন?

খরগোশ : সে কথা মনে করেই তো কাঁদছি।

বাঘ : তোর মনে আবার এত দুঃখ থাকবে কেন? এতটুকু পশু তুই। তোর সুখই কী আর দুঃখই কী?

খরগোশ : আমার অনেক দুঃখ। মনে অনেক কষ্ট।

বাঘ : আমার অভ্যন্তরে যেতে হবে বলে তোর এত দুঃখ! দেখ, আমি হচ্ছি এই অরণ্যের রাজা বাহাদুর। আমার ওপরে কেউ নেই। আমার ডোরাদার পেটের মধ্যে যেতে পারা তোর মতো ক্ষুদ্র পশুর পক্ষে এক মহা সৌভাগ্য!

খরগোশ : আপনার ওপরে আরেক জন আছে। সেই তো সব নষ্ট করেছে। সেই জন্যই তো কাঁদছি।

বাঘ : কী বললি? অত ফোঁপাস নে। ফোঁপালে তোর গোঁফ আর পশম এত থরথর করে কাঁপে যে তাতে সব কথা আটকে যায়। কিছুই পরিষ্কার করে বুঝতে পারছি না। গোড়া থেকে বল। কাঁদছিস কেন?

খরগোশ : আমি এত ছোটো, এত সামান্য, পরিমাণে এত অল্প! আমাকে খেয়ে কি আপনার কোনো পরিতৃপ্তি হবে? এই দুঃখে কাঁদছি।

বাঘ : আমি আবার তোর বেড়াল ভাইয়ের দাদা হই কি না, দিনের বেলায় সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই না। কাছে আয় দেখি। তাই তো, তুই দেখছি সত্যি অতি ক্ষুদ্রকায়। শেয়াল পণ্ডিত দেখছি ভারি পাজি। বেছে বেছে সবচেয়ে শুঁটকোটাকে পাঠাল?

খরগোশ : না না, হুজুর, শিয়াল মামার কোনো দোষ নেই। আপনার জন্য পাঠানো হয়েছিল আমার সেজ আপাকে। ইয়া মোটাসোটা। কী হৃষ্টপুষ্ট!

বাঘ : এ্যাঁ! তাহলে তার বদলে তুই এলি কী জন্যে?

খরগোশ : সেই দুঃখেই তো কাঁদছি। সেজ আপাকে আরেকটা বাঘ খেয়ে ফেলেছে।

বাঘ : কী বললি? আমার মুখের গ্রাস অন্যে কেড়ে নিয়েছে? এত বড়ো সাহস!

খরগোশ : সেজ আপাও কত কান্নাকাটি করল। বারবার আপনার কথা বলল। কিন্তু কিছুতেই শুনল না। ওই বাঘটা দেখতেও ঠিক আপনার মতো। তবে আরো রাগী আরো তেজি। তাই তো কাঁদছি। তখন উপায় না দেখে সবাই আপার জায়গায় আমাকে ঠেলে পাঠাল। আমি কি আপনার খাদ্য হবার যোগ্য। আমার কি সেজ আপার বহর আছে, না সে রকম মেদময় অঙ্গ! আমার কত দুঃখ! সে জন্যই তো কাঁদছি!

বাঘ : কাঁদিস না। আজ বোধ হয় তোকে বাইরেই জীবন কাটাতে হবে। কারণ, আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে নিজের ওই জাত ভাইটির ঘাড় মটকাই। রক্ত হাড় মাংস সব একসঙ্গে মিশিয়ে লোকমা লোকমা খাই! কোথায় ওটাকে পাওয়া যাবে একবার আমাকে দেখিয়ে দিতে পারিস?

খরগোশ : তা পারব। তবে আপনি সামনে থাকবেন, আমি পেছন পেছন এগিয়ে আসব। আপনার সংকল্প দেখে আমার দুঃখ একটু একটু করে কমছে।

বাঘ : কোনো ভয় নেই তোর। আমি সঙ্গে আছি। পথ দেখিয়ে নিয়ে যা। আমি আবার দিনের বেলায় সব ঠিকমতো ঠাহর করতে পারি না। শেষে ভুলে অন্য কাউকে সাবড়ে না দেই।

খরগোশ : আসুন। এই দিক দিয়ে আসুন। এই ঢালু পথটা দিয়ে একটু নিচে নামব। এরপর থেকে জঙ্গল কিছু ঘন হয়ে এসেছে। সাবধানে পা ফেলবেন হুজুর। এইবারে একটু উপরের দিকে উঠতে হবে। পাহাড়িয়া পথ কি না। এর মাথাতেই আপনার দুশমনের গুহা। আসুন আরেকটু এগিয়ে আসুন। আমার ভয় করছে। আপনি সামনে আসুন। গুহার মধ্যে চোখ দিয়ে ভেতরে নিচের দিকে তাকান।

বাঘ : কই, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

খরগোশ : হুজুরের বোধহয় আলোর ঘোর এখনো ভালো করে কাটেনি। আর একটু চেষ্টা করে দেখেন। কিন্তু সাবধান থাকবেন। আপনাকে দেখতে পেলে ও কিন্তু খেপে যাবে।

বাঘ : ওই তো! ওই তো! দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চকচক করছে। অবিকল আমার মতো দেখতে। এঁ্যা! এত বড়ো সাহস, আমাকে চোখ পাকাচ্ছে। খবরদার! আমাকে তুই হুমকি দিস?

খরগোশ : হুজুর!

বাঘ : না না। কোনো কথা নয়। ওর একদিন কি আমার একদিন। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিস? তোর মাথা ফাটাব, দাঁত ভাঙব, গোঁফ উপড়ে ফেলব, চামড়া খুলে ফেলব! কী আমাকে পালটা গালি দিচ্ছিস তুই? তবে রে—হালুম! হালুম! হালুম!

[ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ও কুয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পানির মধ্যে ঝপাৎ করে পড়ার এবং পরে তার মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার শব্দ শোনা যাবে।]

খরগোশ : (নাচতে নাচতে)

হুররে হুয়া, কেয়া মজা, বনের রাজা কুপোকাত
কুয়ার মধ্যে দেখে ছায়া, ঝম্প দিয়ে প্রাণপাত!
হুররে হুয়া কেয়া মজা, কেল্লা ফতে বাজিমাত।
বনের রাজা কুপোকাত,
ঝম্প দিয়ে প্রাণপাত।
তাই তো বলি যত পারো কেবল খাও তরকারি
বাড়বে মেধা গায়ের বল, বুদ্ধি হবে তরবারি
গাজর মুলো শাকসবজি
শক্ত হবে হাতের কবজি,
খেলে পরে পুই পালং টাটকা তাজা শালগম,
হবেই হবে সকল কাজে অতিশয় পারঙ্গম।

অর্থ জেনে নিই

অদ্য — আজ।
অবুঝ — বোঝে না এমন।
অরণ্য — বন।

আত্মত্যাগ	—	পরের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেওয়া।
আপস	—	মিটমাট।
ইষ্টক	—	ইট।
উল্লসিত	—	খুশি।
কদাকার	—	দেখতে খারাপ।
কুপোকাত	—	পরাজিত; ধরাশায়ী।
ক্ষুদ্রকায়	—	ছোটো আকৃতির
গর্জন	—	জোরালো আওয়াজ।
চিত্রিত	—	আঁকা।
নেপথ্যে	—	আড়ালে।
পদচারণা	—	পায়চারি।
পরিতাপ	—	দুঃখ।
পারঙ্গম	—	দক্ষ; পটু।
প্রাণপাত	—	মৃত্যু।
প্রাণ বিসর্জন	—	জীবন দেওয়া।
বজ্রনির্ঘোষ	—	বজ্রের মতো জোরালো আওয়াজ।
বাজিমাত	—	দারুণ সফলতা।
বিদঘুটে	—	অদ্ভুত
ভান	—	নকল আচরণ।
রাক্ষস	—	রূপকথার কল্পিত ভয়ংকর প্রাণী।
সমবেতভাবে থাকা	—	একসাথে থাকা।
সর্বাঙ্গ	—	সারা শরীর।
সহাস্যে	—	হাসিমুখে।
সুরভি	—	সুবাস।
স্তম্ভ	—	থাম
স্বয়ং	—	নিজে।
হৃষ্টপুষ্ট	—	মোটাতাজা।

অনুশীলনী

১. খালি জায়গায় শব্দ বসাই।

উল্লসিত	পরিতাপ	আপস-রফা	সহাস্যে	হৃষ্টপুষ্ট

ক. খেয়েদেয়ে সে .... হয়েছে।

খ. ঝামেলা মেটাতে .... করা হলো।

গ. হঠাৎ কেন যেন সে .... হয়ে উঠল।

ঘ. ওই দিনের ঘটনা নিয়ে এখন .... করে কী হবে!

ঙ. তিনি যে সিদ্ধান্ত দিলেন সেটি সবাই .... মেনে নিল।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কার অত্যাচারে পশুদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল?

খ. বাঘের সাথে কে আপস-রফা করেছিল?

গ. পশুদের সভায় সভাপতি কে ছিল?

ঘ. খরগোশ কেন বাঘের কাছে যেতে চাইল না?

ঙ. খরগোশের প্রিয় খাবার কোনগুলো?

চ. বাঘ কেন কুয়ার মধ্যে লাফ দিলো?

ছ. খরগোশ কীসের জোরে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেল?

৩. যেকোনো দুজন মানুষের মধ্যে সংলাপ লিখি।

: ....

: ....

: ....

: ....

: ....

: ....

: ....

: ....

: ....

: ....

৪। একশব্দে লিখি।

রাগ বেশি যার —

তেজ বেশি যার —

যে বুঝতে চায় না —

পরের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেওয়া —

দেখতে মোটাতাজা —

৫. জোড়াশব্দ দিয়ে বাক্য বানাই।

সুবিধা-অসুবিধা : ....

সুন্দর-অসুন্দর : ....

বেশি বেশি : ....

আশেপাশে : ....

থরথর : ....

৬. শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে নাটকটি অভিনয় করি।

পাঠ ১৫

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে—
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কীসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কীসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি
যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি,
কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে ওঠে জোয়ার-বানে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

রইব না কো বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে—
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে;
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

অর্থ জেনে নিই

আকাশ ফুঁড়ে	—	আকাশ ভেদ করে।
ঘূর্ণিপাক	—	পানি বা বাতাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণন।
জগৎ	—	পৃথিবী।
জাপটে	—	দুহাতে জড়িয়ে।
টুটে	—	ভেঙে; ছিঁড়ে।
ডুবুরি	—	ডুব দিয়ে পানির তলদেশে থেকে বিভিন্ন বস্তু তুলে আনা যার পেশা।
দুঃসাহসী	—	নির্ভীক; অত্যধিক সাহসী।
দেশান্তর	—	অন্য দেশ।
পাহাড়-চূড়ে	—	পাহাড়ের চূড়ায়।
বদ্ধ	—	আটকা।
বরণ	—	গ্রহণ।
মরণ-যন্ত্রণা	—	মৃত্যুর কষ্ট।
যুগান্তর	—	অন্য যুগ।
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে	—	সময়ের আবর্তে।
লুটে	—	ছড়িয়ে।
সংকল্প	—	মনের ইচ্ছা; মনোবাসনা।
সিন্ধু	—	সাগর।
সিন্ধু-যান	—	জাহাজ।

অনুশীলনী

১. শব্দ খুঁজি।

পাঠ থেকে এমন শব্দ খুঁজে বের করি যেখানে দুটি শব্দ মিলে একটি হয়েছে।

ঘূর্ণি+পাক = ঘূর্ণিপাক

....

....

....

....

....

....

২. যুক্তবর্ণ ভাঙি, নতুন শব্দ ও বাক্য তৈরি করি।

যুক্তবর্ণ	ভেঙে লিখি	শব্দ তৈরি করি	বাক্য তৈরি করি
দ্ধ			
ন্ত			
র্ণ			
ন্ত্র			
ন্ধ			
স্ব			
শ্ব			
ন্দ্র			

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?

খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কীসের আশায় মানুষ মরণকে বরণ করছে?

ঘ. সাগরে মানুষ কী কী ধরনের সাহস দেখাচ্ছে?

ঙ. কবি কোথায় কোথায় যেতে চান?

৪. একই অর্থের আরেকটি শব্দ লিখি।

পৃথিবী —

মৃত্যু —

কষ্ট —

সমুদ্র —

চাঁদ —

পর্বত —

৫. 'সংকল্প' কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৬. এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে কবিতার চরণ লিখি।

ক. করছে কীসের মরণ-যন্ত্রণাকে আশায় তারা বরণ

....

খ. বীর মুক্তা আনে কেমন সেঁচে করে সিন্ধু ডুবুরি

....

গ. উথলে সাগর জোরে ওঠে টানলে জোয়ার-বানে কেমন

....

ঘ. মুঠোয় দেখব পুরে হাতের বিশ্ব-জগৎ আমি আপন

....

৭. পাঠ থেকে নাম-শব্দ ও কাজ-শব্দ আলাদা করি।

নাম-শব্দ	কাজ-শব্দ

৮. নিচের শব্দগুলো কোনটি কোন সময়ে ঘটেছে তা আলাদা করি।

দেখব, শুনছি, থাকব, ঘুমাবে, খেয়েছিলাম, যাচ্ছি, পড়ছি, দেখেছিলাম, বলেছিল, নাচবে, চলছে, আসবে, হাঁটছে, ঘুমাত।

এখন ঘটছে	আগে ঘটেছিল	পরে ঘটবে

পাঠ ১৬

স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, পুলিশ, সৈনিক, কর্মকর্তা, নারী, শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষ। আছেন সমতল, পাহাড়, হাওর, নদী, উপকূলসহ সকল অঞ্চলের মানুষ। সকল ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, পুলিশ ব্যারাকে আর বিভিন্ন আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে। নয় মাস ধরে তারা এ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। তারা পরিকল্পনা করে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত, বুদ্ধিজীবী ও বরেণ্য মানুষদের। পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতেই শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখ।

গোবিন্দচন্দ্র দেব

সেলিনা পারভীন

গিয়াসউদ্দিন আহমদ

রণদাপ্রসাদ সাহা

মুনীর চৌধুরী

রাশীদুল হাসান

বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। কুরআন পাঠরত মানুষটিকেই টেনেহিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর দুজনকেই গুলি করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শন বিষয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ-সরল আর নিরহংকার। ওই একই রাতে তাঁকেও হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় আরও অনেক শিক্ষককে।

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। হত্যা করা হয় বহু সাংবাদিককে। সেই রাতে লেখক ও সাংবাদিক শহীদ সাবের পত্রিকা অফিসেই ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে মারা যান তিনি। শহিদ হন সেলিনা পারভীন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন কবি ও সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা।

হানাদাররা হত্যা করে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা তাঁকে হত্যা করে। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাধনা ঔষধালয়। ৮৪ বছর বয়সের এই মানুষটিও রেহাই পাননি। তাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত 'দানবীর' বলে। হত্যা করা হয় তাঁকেও। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নূতনচন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনারা তাঁকেও রেহাই দেয়নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষাশহিদদের স্মরণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে। তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে ওঠে একটি গান– ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।’ এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। এই সুরসাধকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্র করে। তারা জানত চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তখন তারা সেই ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েননি। এর আগেই হানাদারেরা হত্যা করে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে।

তারা প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে তুলে নিয়ে যায়। সাংবাদিক নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, প্রখ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আবদুল আলীম চৌধুরী ও মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরো বহুজনকে। এঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেননি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শহীদুল্লা কায়সার

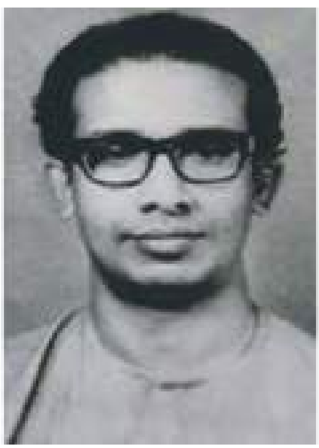

আনোয়ার পাশা

ফজলে রাব্বী

তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা পালন করি 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস'। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের আত্মদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেবো না। আমরা তাঁদের স্মরণ করব চিরদিন।

অর্থ জেনে নিই

অবধারিত — ঘটবেই এমন।

অবরুদ্ধ — বন্দি; আটক।

আত্মদানকারী — অন্যের উপকারের জন্য নিজের জীবন দান করেন যিনি।

খ্যাতনামা — বিখ্যাত।

নির্বিচারে — বাছবিচার না করে।

পাষণ্ড — নিষ্ঠুর; নির্মম ব্যক্তি।

বরেণ্য — বরণ করার যোগ্য।

মনস্বী — জ্ঞানী।

অনুশীলনী

১. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অবরুদ্ধ	অবধারিত	আত্মদানকারী	নির্বিচারে	মনস্বী	খ্যাতনামা

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় ....।

খ. দেশের ভিতরে .... অবস্থায় প্রাণ দেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও .... মানুষদের হত্যা করে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান .... হিসেবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা .... হত্যা করে নিদ্রিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শন বিষয়ে .... শিক্ষক।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

খ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

গ. শহীদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

ঘ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

ঙ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি।

চ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

ছ. কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

৩. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য	মেধাবী
মেধা আছে এমন যে জন	নিরহংকার
অহংকার নেই যার	বরেণ্য
বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা	অপূরণীয়
কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন	নির্বিচার

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিকচিহ্ন (✓) দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

১) ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ
২) ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
৩) ১৯৭১ সালের উনত্রিশে মার্চ
৪) ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয় —

১) ‘স্বাধীনতা দিবস’ হিসেবে
২) ‘মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে
৩) ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে
৪) ‘বিজয় দিবস’ হিসেবে

গ. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় —

১) মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩) ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
৪) সংবাদপত্র অফিসে

৫. কাজ-শব্দ লিখি।

ক. খাওয়া

আমি খাই। আমরা ....।	তুমি ....। তোমরা ....।	সে ....। তিনি ....।

খ. ওঠা

আমি উঠি। আমরা ....।	তুমি ....। তোমরা ....।	সে ....। তিনি ....।

গ. যাওয়া

আমি যাই। আমরা ....।	তুমি ....। তোমরা ....।	সে ....। তিনি ....।

৬. প্রথম বাক্যের সাথে মিলিয়ে পরের বাক্য লিখি।

শুয়ে থাকি। তবু ঘুম আসে না।

কড়া নড়ে। তবু ....।

জানালায় উঁকি দিই। তবু ....।

তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালাম। তবু ....।

আমি সবই জানি। তবু ....।

৭. ঘটনাগুলো সাজিয়ে অনুচ্ছেদ লিখি।

কয়েক দিন পর ডিম ফুটে তুলতুলে ছানা বেরিয়ে এলো।

একদিন ছানারা বড়ো হয়ে উড়তে শিখে গেল।

গাছের মগডালে বাসা বেঁধেছে একজোড়া বক।

স্ত্রী বকটি কয়েকটি ডিম পেড়েছে।

বক দুটি পালাক্রমে সেই ডিমে তা দিচ্ছে।

পুরুষ বক নদী থেকে মাছ ধরে এনে ছানাদের খাওয়ায়।

....

....

....

....

....

....

....

৮. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

পাঠ ১৭

মাটির নিচে পুরানো নগর

বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রাচীনকালে নগর গড়ে উঠেছিল। যেমন– কুমিল্লার ময়নামতিতে সাত-আট শতকের দিকে নগর ছিল। আবার বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকায় তৃতীয় শতকের পরে নগর গড়ে ওঠে।

এগুলোর চেয়ে পুরানো নগর পাওয়া গেছে উয়ারী ও বটেশ্বরে। উয়ারী ও বটেশ্বর নরসিংদী জেলার দুটি গ্রাম। ধারণা করা হয়, সেখানে খ্রিষ্টপূর্ব ছয়-সাত শতকে নগর গড়ে ওঠে। সেই নগর এখন মাটির নিচে চাপা পড়েছে। ২০০০ সালে মাটি খনন করে উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন নগরের রাস্তার নমুনা পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার, পাথরের পুঁতি এবং পুরানো আরো জিনিসপত্র।

নরসিংদী অঞ্চলের শীতলক্ষ্যা নদী ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা। ইতিহাসবিদদের ধারণা, প্রাচীনকালে এখানকার ব্রহ্মপুত্র নদীপথে মানুষ বাণিজ্য করত। সেই নদী থেকে বঙ্গোপসাগর হয়ে সমুদ্রপথে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যোগাযোগ ছিল। তার মানে খুবই সমৃদ্ধ ছিল প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল।

উয়ারী-বটেশ্বরে নগরের খোঁজ হঠাৎ করে মেলেনি। এখানকার সাধারণ শ্রমিকরা মাটি কাটার সময়ে এখানে প্রায়ই পুরানো জিনিস পেতেন। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে একটা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। ওখানকার স্কুলশিক্ষক হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে পুরানো রৌপ্যমুদ্রা। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি পুরানো লোহার টুকরা পান। এগুলো ত্রিকোণাকৃতির এবং একদিকে সুচালো। এরপর ১৯৫৬ সালে উয়ারী গ্রামে মাটি কাটার সময়ে রৌপ্যমুদ্রার একটি ভান্ডার পাওয়া যায়। সেখানে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। হানিফ পাঠানের পুত্র হাবিবুল্লাহ পাঠানও উয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করেন। পরে তিনি সেগুলো জাদুঘরে জমা দেন।

২০০০ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদরা উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় খননকাজ শুরু করেন। তখন মাটির নিচে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগরের সন্ধান মেলে। আরো পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভান্ডার।

উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন— রাঙ্গার টেক, সোনারু তলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গী রাজার বাড়ি, মন্দির ভিটা, জানখাঁর টেক, টঙ্গীর টেক। এসব গ্রামে প্রাচীন বসতির প্রমাণ মিলেছে। এখানে দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মুদ্রা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের পুরানো তৈজসপত্র পাওয়া গেছে। এই স্থানটি সম্ভবত প্রাচীন কোনো রাজ্যের রাজধানী ছিল। পুরানো সেই নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। নগরটিও ছিল যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে সোনাগড়া নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল।

উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিবপুর উপজেলা। এখানকার মন্দিরভিটায় এক বৌদ্ধ পদ্মমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। জানখাঁর টেক গ্রামে একটি বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। হয়তো আরও অনেক নিদর্শন ঢাকা পড়ে আছে মাটির আবরণে।

অর্থ জেনে নিই

ইতিহাসবিদ — ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি।

দুর্গ — শত্রুসৈন্য সহজে প্রবেশ করতে পারে না এমন স্থান।

নিদর্শন — প্রমাণ; উদাহরণ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ — প্রাচীন ইতিহাস ও উপকরণ নিয়ে কাজ করেন যিনি।

মৃত্তিকা — মাটি।

রৌপ্যমুদ্রা — রুপার তৈরি মুদ্রা বা টাকা।

সাম্রাজ্য — সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য।

অনুশীলনী

১. শব্দ নিয়ে খালি ঘরে বসিয়ে বাক্য লিখি।

প্রমাণ	মহাস্থানগড়	ঐতিহাসিক	সভ্যতা	প্রাচীর

ক. এলাকাটি .... স্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

খ. বগুড়ার .... একসময়ে বাংলার রাজধানী ছিল।

গ. দুর্গের চারপাশে থাকত .... আর পরিখা।

ঘ. সাধারণত নদীর তীরগুলোতে .... গড়ে উঠতে দেখা যায়।

ঙ. এসব গ্রামে প্রাচীন বসতির .... মিলেছে।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরানো নগর কোথায় পাওয়া গেছে?

খ. উয়ারী ও বটেশ্বরে কী কী প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে?

গ. কীভাবে উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ পাওয়া যায়?

ঘ. দুর্গ কী?

ঙ. 'খুবই সমৃদ্ধ ছিল প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল'—কীভাবে এটি বোঝা যায়?

৩. প্রশ্ন বানাই।

পাঠ থেকে কী, কেন, কোথায়, কীভাবে, কত, কেমন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন তৈরি করি এবং বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি।

ক. ....

খ. ....

গ. ....

ঘ. ....

ঙ. ....

চ. ....

৪. আজ, গতকাল ও আগামীকাল শব্দ ব্যবহার করে একই রকম বাক্য লিখি।

সুজন আজ বেড়াতে এসেছে।

সুজন গতকাল বেড়াতে এসেছিল।

সুজন আগামীকাল বেড়াতে আসবে।

....

....

....

....

....

৫. আমার এলাকার বিখ্যাত তিনটি জিনিসের নাম লিখি।

....

....

....

৬. সংগ্রহ করি।

পুরানো কয়েন, অন্য দেশের টাকা, ডাকটিকিট, দেশলাইয়ের বাক্স কিংবা পুরানো কোনো জিনিস সংগ্রহ করে সহপাঠীকে দেখাই।

পাঠ ১৮

ইচ্ছামতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্‌খনি হই
ইচ্ছামতী নদী।
রইবে আমার দখিন ধারে
সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায়
নামবে অন্ধকার।

আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরই সাথে—
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই
আপন গাঁয়ের ঘাটে
ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই
দূরের মাঠে মাঠে।
গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা
নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা
সাঁতরে ওপার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের
নতুনতরো বেশ,
নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে
অদ্ভুতের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো
টুকরো আলোর রাশি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন,
হাততালি আর হাসি।
নিচের তলায় তলিয়ে যেথায়
গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই
রয়েছে চুপচাপ।
কোণে কোণে আপন মনে
করছে তারা কী কে।
আমারি ভয় করবে কেমন
তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিনবে আমার
কেবল একটুখানি।
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে
আমিই সে কি জানি?
একধারেতে মাঠে ঘাটে
সবুজ বরন শুধু,
আর একধারে বালুর চরে
রৌদ্র করে ধু ধু।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
রাত্তিরে থম থম!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
করবে গা ছম ছম।

অর্থ জেনে নিই

আধেক — অর্ধেক।
ঘাটের ধাপ — ঘাটের সিঁড়ি।
ডাঙা — তীর; শুকনো জায়গা।
দখিন ধারে — ডান দিকে।
নতুনতরো — অন্যরকম।
নাইতে — গোসল করতে।
বরন — বর্ণ; রং।
রাত্তির — রাতের বেলা।

অনুশীলনী

১. জোড়া শব্দ দিয়ে বাক্য বানাই।

চুপচাপ : ....

মাঠে ঘাটে : ....

ধু ধু : ....

চেয়ে চেয়ে : ....

থম থম : ....

ছম ছম : ....

ঝলমল : ....

২. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি কী হতে চান? কেন হতে চান?

খ. ইচ্ছামতী নদীর কোন দিকে সূর্য ওঠে?

গ. ইচ্ছামতী নদী কোন পারের মানুষের সাথে কথা বলবে?

ঘ. ইচ্ছামতী নদীর দুই ধারের পার্থক্য কী?

ঙ. ইচ্ছামতী নদীতীরের দিন ও রাতের বর্ণনা দাও।

৪. পাঠ থেকে নাম-শব্দ খুঁজে লিখি।

৫. আমি যা হতে চাই সে সম্পর্কে লিখি।

৬. ছড়াটি শেষ করি।

দাদুর প্রিয় লাঠি

মিনির প্রিয় বাটি।

বাবার প্রিয় ....

মায়ের প্রিয় ....।

বোনের প্রিয় ....

ভাইয়ের প্রিয় ....।

মামার প্রিয় ....

খালার প্রিয় ....।

পাঠ ১৯

ভাষার খেলা

১. ঘটনাটি কোন সময়ের, তা বুঝে টিকচিহ্ন (✓) দিই।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন।	আগেকার / এখনকার / পরের
আমরা সবাই মিলে মেলায় যাচ্ছি।	আগেকার / এখনকার / পরের
সে চুপচাপ বসে বই পড়ছে।	আগেকার / এখনকার / পরের
গতকাল এখানে এসেছিলে?	আগেকার / এখনকার / পরের
আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।	আগেকার / এখনকার / পরের
তুমি কি আর কখনো এখানে আসবে না?	আগেকার / এখনকার / পরের

২. গুণ ও বৈশিষ্ট্য লিখি।

ক. লোকটি ....। (লোকটি কেমন?)

খ. শরৎকালে আকাশে .... মেঘ দেখা যায়। (কেমন মেঘ?)

গ. .... চড়ুই আমার বারান্দায় বসে রোদ পোহাচ্ছে। (কয়টি চড়ুই?)

ঘ. কচ্ছপটি .... এগিয়ে চলেছে। (কীভাবে এগিয়ে চলেছে?)

ঙ. সে .... ট্রেনে উঠল। (কীভাবে ট্রেনে উঠল?)

৩. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিয়ে : ....

উপর : ....

কাছে : ....

থেকে : ....

পক্ষে : ....

৪. দুটি বাক্য জোড়া দিয়ে একটি তৈরি করি।

মিলি খেলছে। শিলা খেলছে।

....

আমি পড়া শেষ করব। তারপর খেলতে যাব।

....

গল্পটি পড়লাম। তবে মজা পেলাম না।

....

আমি কবি হতে চাই। তাই বেশি বেশি বই পড়ছি।

....

তুমি খেয়ে যাও। নইলে আমি কষ্ট পাব।

....

৫. একটি বাক্য ভেঙে দুটি তৈরি করি।

আমি চেষ্টা করেছি বলে সফল হতে পেরেছি।

....

তালা লাগানো থাকায় দরজা খুলতে পারলাম না।

....

হরিণটি শিকারির দিকে তাকিয়ে দৌড় দিলো।

....

তুমি সেখানে গেলে তাকে দেখতে পাবে।

....

সে অনেক ভুল করেও ক্ষমা পেয়ে গেল।

....

৬. একই রকম শব্দ খুঁজি।

ঘর	প্রভাত	রজনী	পুস্তক	অরুণ	মেয়ে
সকাল	কপাল	সাগর	দিবস	রাত	বাড়ি
ক্ষুদ্র	মাতা	ললাট	রবি	দিন	ছেলে
কন্যা	জননী	সমুদ্র	বই	ছোটো	পুত্র

ক. ঘর বাড়ি

খ. ....

গ. ....

ঘ. ....

ঙ. ....

চ. ....

ছ. ....

জ. ....

ঝ. ....

ঞ. ....

ট. ....

ঠ. ....

৭. মিলিয়ে মিলিয়ে বাক্য লিখি।

মাছ ধরে জেলে।

বল খেলে ছেলে।

নীল আকাশে উড়ছে পাখি।

....

ওই দেখো ওই দেখো ঘুড়ি।

....

পায় না সে একটুও ভয়।

....

খাচ্ছি আমি পাকা আম।

....

টিক টিক করে চলে টেবিলের ঘড়িটা।

....

৮. দৈনিক পত্রিকা থেকে তিনটি খবরের শিরোনাম লিখি।

ক. ....

খ. ....

গ. ....

৯. শব্দ-জব্দ

ছকের নিচে দেওয়া সূত্র অনুযায়ী ছকটি পূরণ করি।

১	২		■	৩	
৫		■	৬		
■		■	৭		■
৮			■	■	৯
	■	■	১০	১১	
১২			■	১৩	

পাশাপাশি: ১. মুখমণ্ডল, ৩. নিয়ে আসা, ৫. জমিতে দেওয়া হয় এমন জিনিস, ৬. যেখানে আমরা শুই, ৭. শরীরের একটি অংশ, ৮. একটি দেশের নাম, ১০. ফুলের রেণু, ১২. দেহ, ১৩. প্রাণ।

উপর-নিচ: ১. দাঁড়ানোর বিপরীত, ২. বাদশাহ যেখানে বসে বিচার করেন, ৩. এমনটা খেলে ব্যথা পাওয়া যায়, ৪. মায়ের বাবা, ৬. জমি পরিমাপের একক, ৮. নির্দেশ, ৯. আকাশ, ১১. সম্রাট।

১০. ধারাবাহিক গল্প বলি।

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজা তরমুজ খেতে খুব পছন্দ করতেন। একদিন রাজা বড়ো একটা তরমুজ খেয়ে ফেললেন। ...

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

কাজী কাদের নেওয়াজ

বাদশাহ আলমগীর—
কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলভী দিল্লির।
একদা প্রভাতে গিয়া
দেখেন বাদশাহ—শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া
ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে
পুলকিত হৃদে আনত-নয়নে,
শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পায়ের ধূলি
ধুয়ে-মুছে সব করিছেন সাফ্ সঞ্চারি অঙ্গুলি।

শিক্ষক মৌলভী
ভাবিলেন, আজি নিস্তার নাহি, যায় বুঝি তাঁর সবি।
দিল্লিপতির পুত্রের করে
লইয়াছে পানি চরণের পরে,
স্পর্ধার কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে—কোন কালে!
ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিলো তাঁর ভালে।

হঠাৎ কী ভাবি উঠি
কহিলেন, আমি ভয় করি নাকো, যায় যাবে শির টুটি,
শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
দিল্লির পতি সে তো কোন ছার,
ভয় করি নাকো, ধারি না'ক ধার, মনে আছে মোর বল,
বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল।
যায় যাবে প্রাণ তাহে,
প্রাণের চেয়েও মান বড়ো আমি শুনাব শাহানশাহে।

তার পরদিন প্রাতে
বাদশাহর দূত শিক্ষকে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে।
খাস কামরাতে যবে
শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।'

শিক্ষকে কন—'জাহাঁপনা, আমি বুঝিতে পারিনি, হায়,
কী কথা বলিতে আজিকে আমায় ডেকেছেন নিরালায়?'
বাদশাহ কহেন, 'সেদিন প্রভাতে
দেখিলাম আমি দাঁড়ায়ে তফাতে

নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন,
পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ।
নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সযতনে
ধুয়ে দিলো না'ক কেন সে চরণ, স্মরি ব্যথা পাই মনে।'

উচ্ছ্বাস ভরে শিক্ষকে আজি দাঁড়ায়ে সগৌরবে,
কুর্নিশ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চরবে—
'আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির
সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।'

অর্থ জেনে নিই

অঙ্গুলি — আঙুল।
অনর্গল — একটানা।
আনত-নয়নে — নিচু চোখে।
উচ্চরবে — উঁচু কণ্ঠে।
উচ্ছ্বাস — উল্লাস; আনন্দ।
কুমার — ছেলে।
কুর্নিশ করি — অভিবাদন জানিয়ে।
কেল্লা — দুর্গ।
খাস কামরা — নিজের ঘর।
গুরু — শিক্ষক।
চরণ — পা।
জাহাঁপনা — বাদশাহর জন্য সম্মানসূচক সম্বোধন।
টুটি — ভেঙে।
তফাতে — দূরে।

তাহে	—	তাতে।
দিল্লির পতি	—	দিল্লির অধিপতি বা শাসক।
দূত	—	সংবাদ বহন করে আনেন যিনি।
ধূলি	—	ধুলা।
নিরালায়	—	নির্জনে; নিরিবিলিতে।
নিস্তার	—	রক্ষা।
পুত্রের করে	—	ছেলের হাতে।
পুলকিত হৃদে	—	আনন্দিত মনে।
প্রক্ষালন	—	ধোওয়ার কাজ।
প্রাতে	—	সকালে।
বারি	—	পানি।
ভাবি উঠি	—	ভেবে উঠে।
ভালে	—	কপালে।
মৌলভী	—	পণ্ডিত।
যবে	—	যখন।
শির	—	মাথা।
শুধালে	—	শুধাল; জিজ্ঞেস করল।
সঞ্চারি	—	নাড়াচাড়া করে।
সযতনে	—	যত্নের সাথে।
সাফ	—	পরিষ্কার।
স্পর্ধা	—	দুঃসাহস।
স্বয়ং	—	নিজে।
হস্তে	—	হাতে।
হেন	—	এমন।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোকে পরিবর্তন করে লিখি।

পড়াইত	পড়াত
গিয়া	
নিয়া	
ঢালিতেছে	
ভাবিলেন	
দিয়া	
করিছেন	
ভাবিলেন	

লইয়াছি	
ভাবিতে ভাবিতে	
কহিলেন	
শিখিয়াছে	
দেখিলাম	
বুঝিতে	
বলিতে	
বুলাইয়া	

২. কবিতার লাইনকে গদ্য ভাষায় লিখি।

ক. কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলবি দিল্লির।
তাঁর কুমারকে দিল্লির এক মৌলবি পড়াতেন।

খ. শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে।
শাহজাদা একটি পাত্র হাতে নিয়ে গুরুর চরণে পানি ঢালছে।

গ. ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে।

....

ঘ. ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিলো তাঁর ভালে।

....

ঙ. বাদশাহর দূত শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে।

....

চ. পুত্র আমার আপনার কাছে সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?

....

ছ. পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ।

....

৩. যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি এবং দুটি করে শব্দ বানাই।

স্ত	=	স + ত	আস্ত, জলহস্তি
ঞ্চ	=	....	....
স্প	=	....	....
ষ্ঠ	=	....	....
স্ত্র	=	....	....
ক্ষ	=	....	....
র্ণ	=	....	....

৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাদশাহ আলমগীর একদিন সকালে কী দেখলেন?

খ. বাদশাহর ছেলে পানি ঢেলে দেওয়ার সময় শিক্ষক কী করছিলেন?

গ. শিক্ষক কেন ভয় পেলেন?

ঘ. শিক্ষক কী ভেবে মনে সাহস পেলেন?

ঙ. শিক্ষকের উচ্ছ্বাসের কারণ কী?

৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৬. কাকে কী বলে সম্বোধন করি টিকচিহ্ন (✓) দিই।

	তুমি	আপনি	তুই
সহপাঠী	√		√
খেলার সাথি			
মা			
বাবা			
খালা			
খালু			
বড়ো ভাই-বোন			
ছোটো ভাই-বোন			
শিক্ষক			
বড়ো অপরিচিত মানুষ			
ছোটো অপরিচিত মানুষ			

পাঠ ২১

বিদায় হজের ভাষণ

দশম হিজরি। আরব দেশের বহু লোক তখন ইসলাম গ্রহণ করেছে। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন শান্তি ও সাম্যের বাণী।

ওই সময়ে মুহাম্মদ (স) মদিনায় বসবাস করতেন। তিনি তাঁর জন্মস্থান মক্কায় যেতে চাইলেন। এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদিনার হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলো তাঁর কাছে। জিলকদ মাসের শেষে মহানবি (স) সবাইকে নিয়ে মক্কায় এলেন। মক্কার লোকেরাও মহানবিকে (স) দেখার জন্য ছুটে এলো।

সেবার আরব দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় দুই লাখ মানুষ হজ পালন করতে মক্কায় এসেছিল। এত মানুষ দেখে মুহাম্মদের (স) মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আরাফাতের ময়দানে মহানবি (স)-এর এটি শেষ ভাষণ। তাঁর জীবনে এটিই শেষ হজ। আর তাই এ ভাষণ বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তাঁর এই ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

ভাষণের শুরুতে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে বলেন—

'হে লোক সকল! মনে রেখো, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।'

নবিজি বলেন, 'তোমাদের গোলামও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরো না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তা-ই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তা-ই পরতে দেবে। কোনো গোলাম যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

কখনো অন্যায় ও অবিচার করো না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কখনো একজন আরেক জনের সম্পত্তি দখল করবে না। তুমি নিজেই তোমার নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকবে।'

মহানবি (স) আরো বলেন, 'তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। অন্য ধর্মের মানুষের উপর নিজের ধর্ম চাপিয়ে দেবে না।'

মহানবি (স) তাঁর ভাষণে কয়েকটি কথার উপর জোর দেন। এগুলো হলো—

মানুষ হিসেবে নিজেদের মর্যাদা ধরে রাখা।

মেয়েদের অধিকারকে সম্মান করা।

ধনী-গরিবের বৈষম্য না করা।

কাউকে জাতি বা ধর্ম দিয়ে আলাদা না করা।

ভাষণের শেষ দিকে তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এক, আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন। আর দুই, আমার জীবনের আদর্শ। এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।'

সেদিন মুহাম্মদ (স) সমবেত মানুষের কাছে অনুরোধ করেন, 'আজ যারা এখানে আসেনি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ো।'

অর্থ জেনে নিই

আমির — নেতা; শাসক।
গোলাম — চাকর।
জিলকদ — আরবি বছরের একাদশ মাস।
বৈষম্য — পার্থক্য।
সমবেত — একসঙ্গে হয়েছে এমন।
হিজরি — মুসলিমদের চালু করা বছর।

অনুশীলনী

১. প্রায় একই উচ্চারণের শব্দ দিয়ে বাক্য বানাই।

ভাষণ — বক্তৃতা   তিনি ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন।

বাসন — পাত্র   বাসন ধুয়ে খেতে দাও।

দেশ — রাজ্য   ....

দ্বেষ — হিংসা   ....

খবর — সংবাদ   ....

কবর — সমাধি   ....

জড়ো — একত্র   ....

ঝোড়ো — প্রবল বাতাসযুক্ত ....

পরা — পরিধান করা ....

পড়া — পাঠ করা   ....

জোর — শক্তি; গুরুত্ব ....

জোড় — জোড়া   ....

অন্য — অপর   ....

অন্ন — ভাত   ....

প্রতি — প্রত্যেক; উপর ....

পতি — স্বামী   ....

২. ঠিকমতো উচ্চারণ করি।

অনুরোধ — ওনুরোধ্

আহ্বান — আওভান্

সমবেত — শমোবেতো

শ্রদ্ধা — স্রোদ্ধা

স্মরণ — শঁরোন্

অত্যাচার — ওত্তাচার

উজ্জ্বল — উজ্জল্

সাক্ষী — শাক্খি

৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কোন হিজরিতে মুহাম্মদ (স) তাঁর শেষ ভাষণ দেন?

খ. মহানবির (স) শেষ ভাষণ থেকে আমরা কী কী শিক্ষা পাই?

গ. গোলাম যদি আমির হয় তাকে অনুসরণ করতে হবে কেন?

ঘ. ধর্ম বিষয়ে মুহাম্মদ (স) কী বলেছেন?

ঙ. মহানবি (স) কোন দুটি জিনিস মানুষের কাছে রেখে গেছেন?

৪. যতিচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ আকারে লিখি।

আসিফ তার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল

বাবা বললেন কিছু বলতে চাও

আসিফ বলল বাবা আমি স্কুলের শিক্ষাসফরে যেতে চাই

বাবা বললেন এবার শিক্ষাসফরে কোথায় নিয়ে যাবে

আসিফ বলল বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাবা বললেন দারুণ তো

৫. প্রয়োজনীয় শব্দ বসিয়ে বাক্য পূর্ণ করি।

ক. বিদ্যালয়ে আসার পথে ....

খ. ছুটি হয়ে গেলেও তমাল ....

গ. তানিয়া বাংলায় ভালো, কিন্তু ....

ঘ. আমরা সবাই মিলে ....

ঙ. ওই পাখিটা ....

চ. বেশ তো, এবার না হয় ....

পাঠ ২২

আমরা তোমাদের ভুলব না

যাঁরা ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান, আমরা তাঁদের শহিদ বলি। এ দেশ আর এ দেশের মানুষের জন্য বহুকাল ধরে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা শহিদ হয়েছেন।

শহিদ মীর নিসার আলী তিতুমীর

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে ইংরেজদের নির্যাতন থেকে এ দেশের কৃষকদের রক্ষা করতে জীবন দিয়েছিলেন তিতুমীর। আমরা তাঁকে কখনো ভুলব না।

প্রায় শত বছর আগে ইংরেজ শাসন থেকে এ দেশকে মুক্ত করতে যুদ্ধ করেছিলেন সূর্য সেন। যুদ্ধ করেছিলেন প্রীতিলতাসহ অনেকে। সূর্য সেনকে আটক করার পর তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। প্রীতিলতা আত্মাহুতি দেন। আমরা তাঁদের চিরদিন স্মরণ করব।

শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের কথা আমরা সবাই জানি। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে। তাঁদের স্মরণ করেই আমাদের শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে আমরা তাঁদের বিশেষভাবে স্মরণ করি।

শহিদ আমানুল্লাহ মোঃ আসাদুজ্জামান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তানের শাসক ছিলেন আইয়ুব খান। তাঁর অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে একটি গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। সেই অভ্যুত্থানের একজন ছাত্রনেতা ছিলেন আসাদ। পুলিশ খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তাঁর স্মরণে ঢাকায় নির্মাণ করা হয়েছে আসাদ গেট। মতিয়ুর নামের নবম শ্রেণির

একজন শিক্ষার্থীকে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। নিহত হয়েছিলেন আনোয়ারা বেগম নামের একজন মা-ও। তিনি তখন ঘরের মধ্যে বসে তাঁর সন্তানকে খাবার খাওয়াচ্ছিলেন।

শহিদ মতিয়ুর রহমান মল্লিক

শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

শহিদ ড. মুহম্মদ শামসুজ্জোহা

ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে আটক রেখে হত্যা করা হয় সার্জেন্ট জহুরুল হককে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে নিহত হন অধ্যাপক শামসুজ্জোহা। নিহত হন কৃষক-শ্রমিক আর খেটে-খাওয়া অসংখ্য মানুষ। তাঁরা সবাই শহিদ। তাঁরা আমাদের স্মৃতিতে চিরদিন অমলিন থাকবেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়। এটি ছিল আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই। তখন এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে। নানাভাবে আমাদের অধিকার হরণ করে। এ দেশের মানুষ তাদের শোষণ থেকে মুক্তি চায়। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে শহিদ হন অনেক মুক্তিযোদ্ধা। আমরা তাদের স্মরণ করব।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এদেশে অন্যায়-অত্যাচার থামেনি। তাই মানুষ প্রতিবাদ করেছে। শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৮৩ সালে শহিদ হন ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ারসহ অনেকে। গণতন্ত্রের জন্য বুকে-পিঠে স্লোগান লিখে ১৯৮৭ সালে শহিদ হন নূর হোসেন।

শহিদ নূর হোসেন

শহিদ ডা. শামসুল আলম খান মিলন

শহিদ নাজির উদ্দিন জেহাদ

১৯৯০ সালে নিহত হন ডাক্তার মিলন ও জেহাদ। তারপর গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। সারা দেশে অনেক মানুষ মারা যায়। তাঁরা সবাই শহিদ। আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না।

এত ত্যাগের পরও এ দেশের মানুষ অধিকার পায়নি, বৈষম্য কমেনি। অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা তাই ২০২৪ সালে আবার রাস্তায় নামে। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল।

শহিদ আবু সাঈদ

দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রংপুরে প্রতিবাদ করেন ছাত্রনেতা আবু সাঈদ। দুই হাত প্রসারিত করে তিনি পুলিশের সামনে দাঁড়ান। পুলিশ তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণ-অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়।

শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ

ঢাকার উত্তরায় নিহত হন শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। আন্দোলনরত সবার মধ্যে পানি বিতরণ করছিলেন তিনি। চট্টগ্রামে শহিদ হন ওয়াসিম আকরাম। নিহত হয়েছে মায়ের কোলের শিশু ও বাবার সাথে খেলতে থাকা কিশোর পর্যন্ত। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে দেড় হাজারের বেশি মানুষ জীবন

দিয়েছেন। অনেক মানুষ হারিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি। অনেকেই চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। তাঁরা সবাই একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন। সবাইকে নিয়ে একটি সুন্দর রাষ্ট্রে মিলেমিশে বসবাস করার স্বপ্ন ছিল তাঁদের। দেশের জন্যই তাঁরা শহিদ হয়েছেন। আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না।

অর্থ জেনে নিই

আক্রমণ — অন্যের ওপর হামলা।

আন্দোলন — কোনো দাবি আদায়ের জন্য একসাথে বিক্ষোভ করা।

ক্যান্টনমেন্ট — সেনানিবাস।

গণ-অভ্যুত্থান — দেশের মানুষের সম্মিলিত আন্দোলন।

বৈষম্য — পার্থক্য; প্রভেদ; অসমতা।

অনুশীলনী

১. ঘরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফাঁসিতে	কৃষকদের	প্রসারিত	১৯৪৭	শহিদ মিনার

ক. তিতুমীর যুদ্ধ করেছিলেন এ দেশের … … … … … বাঁচাতে।

খ. সূর্য সেনকে … … … … … ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

গ. ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয় … … … … … সালে।

ঘ. ভাষা শহিদদের স্মরণে তৈরি হয়েছে … … … … …।

ঙ. পুলিশের গুলির মুখে আবু সাঈদ দুই হাত … … … … … করে দাঁড়ান।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কাদের আমরা শহিদ বলি?

খ. ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশ বাঁচাতে কারা যুদ্ধ করেছিলেন?

গ. বায়ান্নর ভাষাশহিদদের নাম লিখি।

ঘ. ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা জানি তা লিখি।

ঙ. ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে মানুষ জীবন দিয়েছেন কেন?

৩. বিপরীত শব্দ লিখি এবং বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
বন্দি	মুক্ত	আমরা মুক্ত দেশের মানুষ।
ন্যায়	....	....
যুদ্ধ	....	....
নির্মম	....	....
গণতন্ত্র	....	....
বৈষম্য	....	....

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিকচিহ্ন (✓) দিই।

ক. নিচের কোন বিপ্লবী আত্মাহুতি দেন?

১) সূর্য সেন ২) প্রীতিলতা

৩) তিতুমীর ৪) মতিউর

খ. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তানের শাসক ছিলেন–

১) ইয়াহিয়া খান ২) বেনজির ভুট্টো

৩) আইয়ুব খান ৪) খাজা নাজিমুদ্দিন

গ. ৬৯-এর অভ্যুত্থানে কোন ছাত্রনেতা শহিদ হন?

১) আসাদ　　২) জব্বার

৩) নূর হোসেন　　৪) মতিয়ুর

ঘ. বুকে-পিঠে স্লোগান লিখে নূর হোসেন শহিদ হন–

১) ১৯৮৩ সালে　　২) ১৯৮৭ সালে

৩) ১৯৯০ সালে　　৪) ২০০২ সালে

ঙ. আন্দোলনরত সবার মধ্যে পানি বিতরণ করতে গিয়ে মীর মুগ্ধ শহিদ হন–

১) ঢাকার আজিমপুরে　　২) নরসিংদীর বেলাবতে

৩) ঢাকার উত্তরায়　　৪) রংপুরের পার্কে

৫. পাঠে বর্ণিত বীর শহিদদের একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করি।

পাঠ ২৩

পোস্টার লিখি, প্ল্যাকার্ড লিখি

স্কুলে আসার পথে মিতুর মন খারাপ হয়ে গেল। একটা গাছ কেটে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। সেই গাছের ডালে একটা পাখির বাসা। বাসাটা ভেঙে গেছে। সেখানে ডিম বা ছানা ছিল কি না, বোঝা যাচ্ছে না।

পাখিদের কথা ভাবতে ভাবতে মিতু স্কুলে ঢুকল। মিতুর মন খারাপ দেখে তালিব বলল, 'কী হয়েছে মিতু?'

মিতু সেই কাটা গাছের কথা বলল। তারপর বলল, 'পাখিদের জন্য আমার মন খারাপ লাগছে। কত কষ্ট করে তারা এই বাসাটা বানিয়েছিল। হয়তো সেখানে ডিম বা ছানাও ছিল।'

মিতুর কথা শুনে তালিবেরও মন খারাপ হলো। তালিব আর মিতুর কাছ থেকে অন্যরাও এই কথা শুনল। কেউ কেউ বলল, 'পাখিদের জন্য আমরা কি কিছুই করতে পারি না?'

ঘণ্টা পড়ার পর জামসেদ স্যার ক্লাসে এলেন। তালিব তাঁকে পুরো ব্যাপারটা বলল। জামসেদ স্যার ঘটনা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, 'পাখিদের জন্য গাছ খুবই দরকারি। পাখিরা গাছে বাসা বানায়। তাছাড়া কোনো কোনো পাখি দালানে বা ঘরে বাসা বানায়। অনেক পাখি নদীর তীরেও বাসা বানায়। পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ খুবই দরকার।'

তালিব বলল, 'স্যার, আমরা পাখিদের জন্য কী করতে পারি?'

জামসেদ স্যার বললেন, 'সবাইকে সচেতন করার জন্য আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। যেমন, পোস্টার লিখে দরকারি কথা মানুষকে জানাতে পারি। প্ল্যাকার্ড লিখেও মানুষকে জানাতে পারি।'

তালিব বলল, 'পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড কী, স্যার?'

স্যার বললেন, ‘কোনো দাবি বা তথ্য তুলে ধরার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। বড়ো কাগজে দরকারি কথা লিখে যখন টাঙানো হয়, তখন তাকে বলে পোস্টার। আর শক্ত মোটা কাগজে লেখা হয় প্ল্যাকার্ড। প্ল্যাকার্ড ধরার জন্য কাগজের নিচে কখনো কখনো বাঁশ বা কাঠের ফালি ব্যবহার করা হয়।’

তালিব বলল, ‘স্যার, আমাদের কি এগুলো বানানো শেখাবেন?’

জামসেদ স্যার বললেন, ‘নিশ্চয় শেখাব। পোস্টার বানাতে আমাদের লাগবে বড়ো কাগজ আর লেখার জন্য রং-তুলি বা মার্কার কলম। আর প্ল্যাকার্ড বানাতে লাগবে মোটা শক্ত বড়ো কাগজ আর লেখার জন্য রং-তুলি বা মার্কার কলম। আর লাগবে বাঁশ বা কাঠের ফালি। আগামী ক্লাসে আমরা পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড বানাব।’

মিতু বলল, ‘স্যার, পোস্টার আর প্ল্যাকার্ডে আমরা কী লিখব?’

স্যার বললেন, ‘এসো, কিছু নমুনা লিখে দেখাই।’ তারপর তিনি বোর্ডে লিখলেন:

বেশি বেশি গাছ লাগাই

পাখির জন্য নিরাপদ পৃথিবী গড়ি

পরিবেশ সুন্দর রাখি

গাছ বাঁচলে সবাই বাঁচবে

তালিব বলল, ‘পোস্টার আর প্ল্যাকার্ডে কি একই কথা লেখা হয়?’

জামসেদ স্যার বললেন, ‘পোস্টার আর প্ল্যাকার্ডে একই কথা লেখা যায়।’

অনুশীলনী

১. প্রশ্নের উত্তর লিখি।

ক. পোস্টার কী?
খ. প্ল্যাকার্ড কী?
গ. পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের কথা লিখি।

উপলক্ষ	যা লিখতে পারি
শব্দদূষণ কমানোর জন্য	
সাবধানে রাস্তা পারাপারের কথা জানানো	
গাছ লাগানোর জন্য	
খেলার মাঠের দাবি জানানো	
ঠিক জায়গায় ময়লা ফেলার জন্য	

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি–বাংলা

পরনিন্দা ভালো নয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য